পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার

এবং

রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, ২০১০

প্রদান উপলক্ষে

স্মা র ক গ্র ন্থ

সম্পাদনা

সুকুমার বাগচি

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

সম্পাদকের নিবেদন

স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনাকালে অসমিয়া কবিতা বা বাক্যের উদ্ধৃতিতে আমরা বাংলা হরফ ব্যবহার করেছি, সেগুলির অধিকাংশেরই বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল। অসমিয়া অন্তঃস্থ ব (ৱ)-এর লিপ্যন্তরে মূল উচ্চারণের কথা মনে রেখে 'অ' ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : জীবন ও কর্ম' শীর্ষক রচনাটিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সময়াভাবে অসমিয়া ভাষার পাঠগুলিতে অসমিয়া লিপির 'ৰ' (র) ও ৱ (অন্তঃস্থ ব) রাখতে হল, উদ্ধৃতিগুলির বঙ্গানুবাদও দেওয়া গেল না। এই ত্রুটির জন্য আমি দুঃখিত।

প্রতিটি রচনায় আধুনিক বানানরীতি অনুসরণ করেছি, তবে উদ্ধৃতিগুলির ক্ষেত্রে মূল বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে। স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের, বিশেষত রমানাথ ও শ্যামাশিস ভট্টাচার্যের নিরন্তর সহযোগিতা ও সহায়তা পেয়েছি; এ-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি।

প্রাক্-কথন

আমার বাবা রমানাথ ভট্টাচার্য নিজে একজন কবি, একই সঙ্গে অন্যের কবিতার প্রতিও রয়েছে তাঁর গভীর ভালোবাসা। এককথায়— তিনি কবিতা-অন্ত-প্রাণ। আবার, আমাদের দুই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ এবং ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে তাঁর জীবন, চিন্তাধারা ও কাজের মধ্যে। অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি বাবার অসীম অনুরাগের মূলেও পদ্মনাথের পঁচিশ বছরের শ্রমের ফসল 'কামরূপশাসনাবলী'-কে চিহ্নিত করা যায়। অনুরূপ ভালোবাসা থেকেই বাবা ১৯ জন অসমিয়া কবির ৮৯টি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন 'আধুনিক অসমিয়া কবিতা' এবং নীলমণি ফুকনের ৫১টি অনূদিত কবিতার সংকলন 'পড়োশি গোলাপ'। অন্যদিকে রামনাথ বিশ্বাসের সংস্কারমুক্ত সংগ্রামী জীবন ও বিশ্বপর্যটনের অভিজ্ঞতা বাবার মনে বুনে দিয়েছে উদারতার বীজ।

এইসব কারণে, বাবার নামে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন গঠনের পরে অসমিয়া ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা এবং উল্লিখিত দুই পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে প্রতিবছর পদ্মনাথ-রামনাথ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর কবিতার প্রতি বাবার বিশেষ অনুরাগের কথা মনে রেখে এটাও স্থির করা হয় যে, পুরস্কার দুটি দেওয়া হবে অসমিয়া ও বাংলা ভাষার দুজন কবিকে— তাঁদের জীবনজোড়া সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ।

এই ফাউন্ডেশনের মুখ্য উপদেষ্টা কবি-সাংবাদিক সুকুমার বাগচি আমাদের অনুরোধে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। সেজন্য তাঁকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আমরা চাই, বাংলা ও অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতি হাতে হাত ধরে চলুক। পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানের সূচনাতেও তাই একটি অসমিয়া ভক্তিমূলক লোকগীতি-র সঙ্গে রাখা হয়েছে আমাদের অন্য এক স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ রচিত একটি সুপরিচিত ভক্তিগীতি। কামনা করি, সম্প্রীতির বাতাবরণে সকলের জীবন সুস্থ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক।

শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
সাধারণ সচিব
রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

গুয়াহাটি,
১৩ মার্চ ২০১১

সবিনয় নিবেদন

আমার নামে মুম্বাইয়ে একটি ফাউন্ডেশন গঠিত হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি করণীয় কাজের সঙ্গে এই ফাউন্ডেশনের প্রধান উদ্দেশ্য আমার ঘনিষ্ঠ দুই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ (সম্পর্কে আমার পিতা রমণীমোহনের জ্যেষ্ঠতাত) এবং ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের (সম্পর্কে আমার বাবার জ্যাঠতুতো দাদা) স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ প্রতিবছর দুটি সাহিত্য-পুরস্কার প্রদান। প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫১,০০০ টাকা, সেইসঙ্গে একটি স্মারক ও মানপত্র। পদ্মনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি দেওয়া হবে অসমিয়া ভাষার একজন বিশিষ্ট কবিকে এবং রামনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি দেওয়া হবে বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট কবিকে। পুরস্কারপ্রাপকদের নাম নির্বাচনের ব্যাপারে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ তাঁদের সারাজীবনের কাব্যকৃতির উপর গুরুত্ব দেবেন।

প্রতিবছর মার্চ-এপ্রিল মাসে গুয়াহাটিতে পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান হবে। এই অনুষ্ঠানে অসমিয়া ও বাংলা সাহিত্যের নির্দিষ্ট বিষয়ে ভাষণ দেবেন সংশ্লিষ্ট ভাষার দুজন বিখ্যাত লেখক। স্মারক বক্তৃতা দুটির বিষয় নির্ধারণ করবেন ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ। এ-ছাড়া পদ্মনাথ ও রামনাথের জীবন ও কৃতির উপর আলোকপাত করবেন অন্য দুই বিশিষ্ট পণ্ডিত।

২০১০ সালের পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত আজকের এই অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন হরেকৃষ্ণ ডেকা এবং তরুণ মুখোপাধ্যায়। আর পদ্মনাথ ও রামনাথ সম্পর্কিত নিবন্ধ দুটির লেখক যথাক্রমে প্রশান্ত চক্রবর্তী এবং শ্যামসুন্দর বসু। চারটি লেখাই এই স্মারকগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২০১০ সালের জন্য পদ্মনাথ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার এবং রামনাথ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তুলে দেওয়া হচ্ছে যথাক্রমে কবি অজিৎ বরুয়া এবং কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের হাতে। তাঁদের সম্মান জানাতে পেরে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্টি অনুভব করছেন।

রমানাথ ভট্টাচার্য
সভাপতি
রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

গুয়াহাটি,
১৩ মার্চ ২০১১

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : জীবন ও কর্ম

প্রশান্ত চক্রবর্তী

॥ এক ॥

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ একজন মহান গবেষক-পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও এ-যুগে প্রকৃতপক্ষে বিস্মৃতপ্রায়। স্বল্পসংখ্যক ইতিহাসের ছাত্র-পণ্ডিতের মধ্যেই তাঁর স্মৃতি অবশিষ্ঠাংশ হয়ে আছে। আজ যে-মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'-র জন্ম শতবর্ষ সমাগত। আর এই 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' কিন্তু এই পণ্ডিতপ্রবরেরই মানস-সন্তান। এটা আমার কথা নয়। স্বয়ং স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ কনকলাল বরুয়া লিখেছেন— 'The idea of founding the society [কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি] was first conceived by Pandit Padmanath Bhattacharya Vidyavinod.'[১]

কনকলাল বরুয়া-উচ্চারিত সেই নাম মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ। কটন কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক। শতবর্ষ-প্রাচীন কটন কলেজের ইতিহাসেও পদ্মনাথ আজ প্রায়-বিস্মৃত একটি নাম।

তবুও সুখের কথা, ইতিহাস কথা বলে। বিস্মৃতির আড়ালেও রেখে যায় পদচিহ্ন। যে-জন্য পদ্মনাথকেও সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায়নি। আমাদের পরম সৌভাগ্য, কটন কলেজের আরেক খ্যাতনামা পণ্ডিত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য পদ্মনাথের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অসাধারণ তথ্যবহুল জীবনী প্রণয়ন করে গেছেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'য় এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই জীবনীতে যদিও জীবনী অংশ কম এবং কর্মরাজির অংশ বেশি, তবু পদ্মনাথ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনার ক্ষেত্রে এই পুস্তিকাটি একটি আকরগ্রন্থের মর্যাদা পাবে। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন এই জীবনী প্রণয়নের ক্ষেত্রে মূল নথি হিসাবে যে-ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি গ্রহণ করেছিলেন, সেটি হল— শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত পদ্মনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী 'শোকসিন্ধু'। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুআরি; সিলেট শহরের তোপখানা থেকে। লক্ষণীয়, পদ্মনাথের প্রয়াণের চার মাসের মাথায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, পদ্মনাথের জীবনাবসান হয় ১৯৩৮-এর ৩০ অক্টোবর।।

'শোকসিন্ধু'-তে শ্রীশচন্দ্র একটি পদ্যে প্রথমেই পদ্মনাথের জীবনের নানা কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পরে গদ্যে জীবনী অংশ। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে এই দুটি গ্রন্থের তথ্য গ্রহণ করেছি।

॥ দুই ॥

মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের জন্ম ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর (২১ ভাদ্র ১২৭৫ বঙ্গাব্দ, ১৭৯০ শকাব্দ)।[২] শ্রীহট্টের কসবা বানিয়াচঙের বিদ্যাভূষণ পাড়ায়, রাজ-কাত্যায়ন বংশে। পিতা পঞ্চানন, মা হরসুন্দরী। শৈশবে তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে (১৮৬৯-জানুআরি)। তখনও অন্নপ্রাশন হয়নি। ধাত্রীমাতা তারাসুন্দরী দাসীর কোলেই তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। চার বছর বয়স পর্যন্ত তাঁকে পরম যত্নে লালন-পালন করেন তারাসুন্দরী। পদ্মনাথ এই মহীয়সী নারীর ঋণ সারা জীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। পরবর্তীকালে ধাত্রী মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি পুকুর খনন করিয়েছিলেন।[৩]

পদ্মনাথের পিতার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তাঁর শৈশব তাই আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেই কেটেছে। বিদ্যারম্ভের পর তাঁকে পিসতুতো দাদা মথুরানাথ ভট্টাচার্যের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে তিনি 'বোধোদয়' পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর বানিয়াচঙের লোকনাথ মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভরতি হন ১৮৭৯-তে। ১৮৮২-তে তিনি সিলেট সরকারি স্কুলে ভরতি হন। এই সময়ে তিনি অগ্রজ পরমানন্দ কবিচন্দ্রের সঙ্গে থাকতেন। কবিচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য, আয়ুর্বেদ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। অনুমান করা যায়, পদ্মনাথের জীবনে এই কবিচন্দ্রের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ওই স্কুল থেকেই পদ্মনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং তদানীন্তন সমগ্র 'আসাম প্রদেশ'-এ প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক ও বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৮-তে এফএ উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঢাকা কলেজে বিএ ক্লাশে ভরতি হন। বিএ শ্রেণিতে তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় অনার্স নিয়েছিলেন। পরে তাঁর একান্ত শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক উইলসন সাহেবের নির্দেশে দর্শন শাস্ত্রেও অনার্স নেন। তিনটি বিষয়ে অনার্স থাকায় তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত; দৈনিক আঠারো ঘণ্টা পড়তেন তখন। এ-সময়ে তিনি ইতিহাসে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য 'ডনেলি মেডেল' লাভ করেন এবং ইংরেজি রচনা প্রতিযোগিতায় 'লেইজ প্রাইজ' পান।

১৮৯০-এ পদ্মনাথ তিন-তিনটি বিষয়ে অনার্স সহ বিএ পাশ করেন। ইংরেজি ও দর্শনশাস্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণি, সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণি। তারপর কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভরতি হলেও পরে ইংরেজি বিষয় নিয়ে ঢাকায় পড়তে যান। এই সময়েই তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি 'ঢাকা সারস্বত সমাজ' কর্তৃক 'সরস্বতী' উপাধি লাভ করেন। পরে তা 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে রূপান্তরিত হয়।

১৮৯২-এ তিনি ইংরেজিতে এমএ পাশ করেন।

॥ তিন ॥

এপ্রিল ১৮৯৩-এ পদ্মনাথ সিলেটের মুরারীচাঁদ কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন। তখন কলেজে একজন অধ্যাপক একটি বিষয়ই পড়াতেন—অথচ পদ্মনাথ পড়াতেন চারটি বিষয়—ইংরেজি, সংস্কৃত, লজিক ও ইতিহাস।

১৮৯৩-এর নভেম্বর মাসে পদ্মনাথ ১০০ টাকা বেতনে শিলঙের আসাম সেক্রেটারিয়েটে যোগ দেন। ওই চাকরির কার্যকাল ১৮৯৬-এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। পদ্মনাথের জীবনের এই শিলং-পর্ব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। গোটা উত্তর-পূর্বের বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্মেষলগ্ন তখন। এদিকে ১৮৯৪-এ (১৭ বৈশাখ, ১৩০১ বাং) কলকাতায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' স্থাপিত হয়; কিন্তু তার আগেই শিলঙে 'শিলং সাহিত্য সভা' স্থাপিত হয়ে গেছে ১৮৯০-এ। শিলঙেও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর শাখা স্থাপনের লক্ষ্যে শিলং সাহিত্য সভার কর্মকর্তারা চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। শিলং থেকেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রথম চিঠি লেখেন শিলং সাহিত্য সভার সম্পাদক হরিচরণ সেন। পরিষদ স্থাপিত হয় ১৭ বৈশাখ, আর হরিচরণ সেন শিলং থেকে চিঠি লিখছেন ২ আশ্বিন ১৩০১ বাংলায়। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পরবর্তী বৈঠকে হরিচরণের চিঠিটি পঠিত হয়। এ-বিষয়ে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস'-এ বলা হয়েছে : 'সারা ভারতবর্ষব্যাপী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শাখা-পরিষদ স্থাপন পরিকল্পনার ইহাই সূচনা।'[৪]

পদ্মনাথ যেখানেই যেতেন সেখানেই কোনো-না-কোনো সাংগঠনিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়তেন। ১৮৯৩-এ শিলঙে চাকরি করতে এসেও এ-ধরনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন পদ্মনাথ। তাঁর নিজের মুখেই সে-কথা শোনা যাক :

'রাজকার্য্যোপলক্ষে সর্ব্বপ্রথম আমাকে আসামের রাজধানী খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী শিলং সহরে যাইতে হইয়াছিল। সেইস্থলে কতিপয় বঙ্গসাহিত্যানুরক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংস্থাপিত "শিলং সাহিত্যসভা" নামক একটি পুস্তকাগার ছিল; ইহাকে অন্বর্থনামা করিবার জন্য ইহার একটি সমালোচনী শাখা স্থাপিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে মধ্যে মধ্যে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ হইত।...

এই সাহিত্য সভার সদস্যগণ "সাহিত্যসেবক" নামে একখানি মাসিক পত্র কিঞ্চিদধিক দুই বৎসরকাল প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহার সম্পাদক সমিতির সভ্যরূপে আমাকে কাজ করিতে হইয়াছিল।'[৫]

কটন কলেজে যোগদানের পাঁচ বছর আগেই গুয়াহাটিতে পা রেখেছিলেন পদ্মনাথ। দিনটি ছিল ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর। তখন পদ্মনাথ অধ্যাপক হিসাবে আসেননি, সরকারি কর্মচারী হিসাবে এসেছিলেন। আসলে ঘটনাচক্রে তাঁকে আসতে হয়েছিল। কর্মজীবনের সূচনাতে পদ্মনাথের গুয়াহাটিতে পাকাপাকি চলে আসার নেপথ্যে ছিল কয়েকটি সংঘাতপূর্ণ ঘটনা। এ-জন্য তাঁর কর্মজীবনের প্রথম পর্বের দিকে নজর দেওয়া যাক। শিলঙে আসাম সেক্রেটারিয়েটে কর্মরত অবস্থায় এই সংঘাতের সূচনা। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি। পদ্মনাথের জীবনী-প্রণেতা শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর ভাষায় :

"এই সময়ে Mr. Gait আসাম সরকারের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি আসামের এক ইতিবৃত্ত লিখিয়া প্রকাশ করিলে, সুপণ্ডিত পদ্মনাথ তাহার অতি সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া একখানা ইংরেজী পুস্তিকা (A critique on Mr. Gait's History of Assam) প্রণয়ন করেন এবং তাহাতে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় Gait সাহেবের ভুলভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। শুনা যায় ইহার বিষময় ফলেই তাঁহার কেরাণী জীবনের উন্নতি চিরতরে বিনষ্ট হয়।"[৬]

গেইট সাহেব অবশ্য বইটির পরের সংস্করণে পদ্মনাথের কথা ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছিলেন।

যা হোক, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়ায় পদ্মনাথ শিলং ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার চিন্তা শুরু করলেন। সে-সুযোগও এসে গেল। সুরমা ভ্যালির সেকালের প্রসিদ্ধ ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব স্কুল্‌স রায়সাহেব নবকিশোর সেন তখন অবসর গ্রহণ করেন। পদ্মনাথ সেই ফাঁকা পদে যোগ দিয়ে (১৮৯৭-এর ১ জানুআরি) জন্মভূমি শ্রীহট্টে চলে যান।

এই সময়ে সাহিত্যচর্চা ও গবেষণার কাজে নিজেকে আরও বেশি করে জড়িত করেন পদ্মনাথ। শ্রীহট্টের ইতিহাসের বহু তথ্য সংগ্রহ করেন তিনি। পরবর্তীকালে তাঁর সংগৃহীত তথ্যাদি তুলে দেন 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' প্রণেতা অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির হাতে। শুধু তা-ই নয়, ওই মহাগ্রন্থের প্রকাশের ব্যয়ভারও বহন করেন তিনি। পদ্মনাথের সে-সময়ের কর্মব্যস্ততা প্রসঙ্গে অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য লিখেছেন :

"তাঁহার চাকরিজীবন নানা কৃতিত্বে পরিপূর্ণ। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সাব্ ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্‌দের নিয়া এক সম্মিলনে কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া সারা বৎসরের কার্যের নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা চালাইতে থাকেন। পণ্ডিতসভায় আহূত হইয়া সম্মিলনে সংস্কৃত প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষার পাঠ্য নির্ধারণপূর্বক ডি.পি.আই-এর নিকট এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন...।"[৭]

কিন্তু ওই রিপোর্টে কাজ তো হলই না, পরে উক্ত ডি.পি.আই-এর সঙ্গেই তাঁর মতানৈক্য চরমে ওঠে। এ-প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন :

"এই সময় Dr. Booth আসাম শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার ছিলেন। সরকারী কোন বিষয়ে স্বাধীন অভিমত প্রদান করিয়া উক্ত সাহেবের সহিত তাঁহার বিষম মনোমালিন্য ঘটে। ডাক্তার বুথ তাঁহার স্বমতে মত দিতে পণ্ডিত পদ্মনাথকে ইঙ্গিত করিলে, তিনি অতিশয় অবজ্ঞার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে বিষম বিরোধের সৃষ্টি হয়। Dr. Booth তাঁহাকে নানা ভয় দেখাইয়াও যখন বাধ্য করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে গৌহাটীতে বদলী করেন।"[৮]

অথচ সে-সময়ে অসমে ডেপুটি ইনস্পেক্টরদের বদলি করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

যা হোক, গুয়াহাটিতে এলেন পদ্মনাথ। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই আবার তাঁকে অন্য কর্তব্যে ঠেলে দেওয়া হল। সরকারি নথির ভাষায় 'On special duty in connection with Census Work, from 7th March 1901.'[৯]

পদ্মনাথ যখন গুয়াহাটি এসেছিলেন তখন কটন কলেজ স্থাপনের কাজ জোরকদমে চলছে। ৭ মার্চ ১৯০১-এ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট অব সেন্সাস হিসাবে গুয়াহাটিতেই দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি, আর দু-মাসের মধ্যেই (২৭ মে ১৯০১) কটন কলেজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। কটন কলেজ স্থাপনের লগ্নে পদ্মনাথ শহরেই ছিলেন অথচ কটন-সংক্রান্ত কোনো নথিপথে তাঁর উল্লেখ নেই। কলেজ উদ্‌বোধনের দিন গৌরীপুরের রাজা প্রভাত বড়ুয়া রাজবাড়ির পাখোয়াজবাদক-সহ এসেছেন, শিলং থেকে নেমে এসেছেন কটন সাহেব-সহ সরকারি বড় বড় আমলারা, গুয়াহাটির সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত— কিন্তু পদ্মনাথের নাম কোথাও নেই। পদ্মনাথ কি সেই ঐতিহাসিক সভায় উপস্থিত ছিলেন?

তবে সেই সময়ের অন্য একটি ঘটনার কথা পদ্মনাথ স্বয়ং নিজের লেখায় উল্লেখ করেছেন। তখন স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকা হয়ে অসম সফরে এসেছেন। ভ্রমণসূচিটা এ-রকম : প্রথমে

কামাখ্যা-দর্শন, তারপর শিলং, সেখান থেকে আবার গুয়াহাটি। বিবেকানন্দের জীবনী-প্রণেতা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখছেন :

"ঢাকা হইতে স্বামিজী কামাখ্যা পীঠ ও চন্দ্রনাথ দর্শনে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গোয়ালপাড়া ও গৌহাটিতে কয়েকদিন বিশ্রাম করিতে হইল। গৌহাটিতে স্বামিজী তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যোগ্যব্যক্তির অভাবে উহার কোন নোট লওয়া হয় নাই।"[১০]

বিবেকানন্দের এই পরিভ্রমণকালে পদ্মনাথ স্বামীজির মুখোমুখি হয়েছিলেন কয়েকবার। দুজনের মধ্যে মতবিনিময়ও হয়েছিল। কুড়ি বছর পরে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকার ১৩২৭-এর ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় 'আসামে বিবেকানন্দ' নামে স্মৃতিচারণমূলক লেখায় পদ্মনাথ বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। স্বয়ং পদ্মনাথের ভাষায়ই শোনা যাক সেই বৃত্তান্ত :

"...তখন গৌহাটিতে সেন্সাস্ আপিস ছিল—সেই আপিসে কাজ করিতাম। ... ১৩০৭ সালের মহাবিষুব সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ গৌহাটি সহরে আগমন করেন। সঙ্গে অনেক পুরুষ ও দু-একজন স্ত্রীলোকও ছিলেন—তাঁহার জননীও না কি কামাখ্যা দর্শনার্থ এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অবস্থানের নিমিত্ত একটি সুবৃহৎ 'বাঙ্গলো' ঘর দেওয়া হয়—এবং গৌহাটিস্থ সর্বসাধারণ হইতে চাঁদা সংগ্রহপূর্বক তাঁহাদের আহার ও যাতায়াতের ব্যয় প্রদান করা হয়।"[১১]

সংক্রান্তির ঠিক আগের দিন বিকেলে জনৈক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে পদ্মনাথ বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করতে সেই বাংলোতে গেলেন। বারান্দায় টুলের উপর গেরুয়া ধুতি ও গেঞ্জি পরা এক ভদ্রলোক একা বসেছিলেন। চুল এলোমেলো, পান চিবিয়ে ঠোঁট লাল। পদ্মনাথ ভাবলেন বোধহয় স্বামীজির কোনো 'চেলা'। তাঁকেই পদ্মনাথ স্বামীজি সম্পর্কে জিগ্যেস করলেন। সেই ভদ্রলোক ঈষৎ হেসে বললেন— 'তা, আপনাদের কী কথা আছে বলুন।' পদ্মনাথ চিনতে পারলেন। লিখেছেন : "তখন বুঝিলাম, ইনিই বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ।"

প্রথম সাক্ষাৎ মন্দ হল না। প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে কথা হল। কথা গড়াল তর্ক-বিতর্কে। পদ্মনাথ ত্রিশ-বত্রিশের যুবক। বিশ্বখ্যাত সন্ন্যাসীর সঙ্গে অসমের উদীয়মান তরুণ পণ্ডিতের তর্কযুদ্ধ জমে উঠল। পদ্মনাথ খানিকটা উত্তেজিতও হয়েছিলেন। ফলে সেদিন আলোচনায় ইতি টেনে চলে এলেন।

কিন্তু মনের ভেতর রেশটা থেকেই গেল। ইতিমধ্যে শোনা গেল, সংক্রান্তির দিন কামাখ্যাদর্শন সেরে স্বামীজি পরদিন বশিষ্ঠ আশ্রমে যাবেন। পদ্মনাথ ভাবলেন, বশিষ্ঠ আশ্রমে স্বামীজির সঙ্গে কথোপকথনের সময় ও সুযোগ পাওয়া যাবে। কোনো কারণে স্বামীজি বশিষ্ঠ গেলেন না। পদ্মনাথ ক্ষুণ্ণ মনে শহরে ফিরে এলেন। ফিরেই শোনেন, স্বামীজির বক্তৃতা হচ্ছে। শুনেই ছুটলেন সেদিকে।

লোকে লোকারণ্য, ভিড় ঠেলে সামনে যাওয়া মুশকিল। পদ্মনাথ জনতার পেছনে কোনোক্রমে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে অসমের বিশিষ্ট সংস্কৃত-পণ্ডিত ধীরেশ্বরাচার্যের সঙ্গে স্বামীজির সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন হয়ে গেছে।[১২] সভা নিস্তব্ধ। স্বামীজি বারবার কোনো একটা প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন করতে বলছেন, কিন্তু কেউই এগিয়ে এল না। স্বামীজি তখন জানতে চাইলেন— 'সেই ভট্চার্জি কোথায়?' পদ্মনাথ লিখছেন : "খোদ 'ভট্চার্জি' জনতার অন্তরালে"। যে-কোনো কারণেই হোক-না কেন পদ্মনাথ চুপ করে গেলেন।

গুয়াহাটিতে আবার বিবেকানন্দ-পদ্মনাথ সামনাসামনি হয়েছিলেন। এবং তা স্বামীজির শিলং থেকে ফেরার সময়। এবার একান্তে, নির্জনে, শুধু দুজনে কথা হল। পদ্মনাথ লিখেছেন:

"...তিনি অকপটে এবং অত্যন্ত অমায়িকভাবেই আলাপ করিয়াছিলেন। হাঁপানিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্বামীজি শুনিয়াছি, যোগীদের শ্বাসের উপর অধিকার জন্মে— এ দেখিতেছি শ্বাস আপনার উপরে অধিকার করিয়া বসিয়াছে! ইহার অর্থ কি?' তিনি উত্তরে মাত্র বলিলেন— 'ভট্চাজ মহাশয়, বল্‌ব, বল্‌ব।' আমি আর বাড়াবাড়ি করি নাই। কিন্তু মনে মনে যাহা ভাবিলাম— তাহা যখন স্বামীজিকে বলিতে সাহসী হই নাই, তখন এস্থলেও না বলাই সঙ্গত।"[১৩]

পদ্মনাথ ঠিকই লিখেছেন; স্বামীজির শরীর তখন খুব খারাপের দিকে। তাঁর জীবনী-লেখক জানাচ্ছেন :

"ঢাকাতেও স্বামিজীর শরীর ভাল ছিল না। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কামাখ্যা হইতে স্বামিজী যখন গৌহাটী ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা এত মন্দ যে, সঙ্গীয় ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী সমধিক চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।"[১৪]

বিবেকানন্দকে এত কাছে পেয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল পদ্মনাথের। তবু তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্বে। সব শেষে তাই লিখেছেন : "মনে হইল যে, এই সন্ন্যাসীর সাজপরা লোকটি যেন মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত একটি কেশরী।"

॥ চার ॥

১৯০২-এর ২ জুন পদ্মনাথকে আবার সুরমা ভ্যালিতে পূর্বপদে পাঠানো হয়। ১৯০৫-এর ১ মে-তে তাঁর পদোন্নতিও ঘটে। সেই সময় তদানীন্তন চিফ কমিশনার স্যার বেমফিল্ড ফুলার সব স্কুল-সাব ইনস্পেক্টরদের ডেপুটি পদে উন্নীত করেন এবং জনৈক প্রমোদকুমার বসুকে সুরমা ভ্যালির ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত করেন। পদ্মনাথ এর প্রতিবাদ করেছিলেন। পদ্মনাথের বিরোধীরা প্রচার করেন—এ-কাজের আড়ালে পদ্মনাথের হাত রয়েছে। সিলেটে বিশাল প্রতিবাদ সভাও হয়। সরকারি উকিল রায় বাহাদুর দুলালচন্দ্র দেবকে দিয়ে ঘটনাটির তদন্ত করানো হয়। তদন্তে পদ্মনাথের কলঙ্ক ঘুচল ঠিকই কিন্তু পদ্মনাথ চাকরিতে ইস্তফার জন্য মনস্থির করে ফেলেন। সরকারের কাছে এই মর্মে এক চিঠি লেখেন যে— হয় তাঁকে কটন কলেজের প্রফেসর নিযুক্ত করা হোক, অথবা চিঠিটিকে পদত্যাগপত্র রূপে গণ্য করা হোক।

অবশেষে কটন কলেজে এলেন পদ্মনাথ। দিনটি ছিল ১৫ জুন ১৯০৫ । তাঁকে সংস্কৃত ও ইতিহাসের 'প্রফেসর' হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

॥ পাঁচ ॥

পদ্মনাথ যখন কটন কলেজে এলেন, কটন তখনও ততটা জমজমাট হয়ে ওঠেনি। গুটিকতক ছাত্র ও হাতে-গোনা অধ্যাপকমণ্ডলী। তবে কয়েকবছর গড়াতেই উজ্জ্বল অধ্যাপকরা আসতে শুরু করেন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির আসরও জমজমাট হয়ে ওঠে। এদিকে গুয়াহাটিতে তখন অসমিয়া-বাঙালির যৌথ প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। শোনা যায়, ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'আর্যনাট্য সমাজ'-এর জমি দান করেছিলেন অনারেব্‌ল মানিকচন্দ্র বরুয়া। মাঝেমধ্যে অসমিয়া নাটকও এখানে অভিনীত হত। গোপীনাথ বরদলৈয়ের দাদা ইন্দ্রেশ্বর বরদলৈ, কুমুদেশ্বর গোস্বামী, মানিকচন্দ্র চৌধারি প্রমুখ সেকালের বিশিষ্ট অসমিয়া অভিনেতারা এতে অংশ নিতেন। সে-আমলে অনেক বাঙালি অভিনেতাও অসমিয়া নাটকে অভিনয় করতেন। এ-রকম একজন অভিনেতা ছিলেন রমেশ সরস্বতী।[১৫]

এদিকে ১৯০০ সালে লর্ড কার্জন হঠাৎ অসম ভ্রমণে আসবেন বলে ঘোষিত হল। সাজ সাজ রব। মানিকচন্দ্র বরুয়ারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সংগৃহীত হল চৌদ্দ হাজার টাকা। জাজেস ময়দানে বিরাট সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হল ১৩ মার্চ। খরচ হল ছয় হাজার। বাদবাকি টাকায় একটা পাবলিক হল করার প্রস্তাব তোলেন মানিকচন্দ্র। ওই বছর সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হল কার্জন হল। প্রথম সেক্রেটারি মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী।[১৬] লাইব্রেরিয়ান গোপালকৃষ্ণ দে।

সময়টা তো খুব স্পর্শকাতর ছিল। সবে ১৮৭৩ সালে অসমিয়া ভাষা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আবার সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৮৩৬ থেকে ওই সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষার দখলদারিকে অসমিয়া মহলের অধিকাংশই মেনে নিতে পারেননি। দূরত্ব ও তিক্ততার পরিবেশ তীব্র রূপ নিচ্ছিল। এবং বাঙালিদের ষড়যন্ত্রেই অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতি 'নিজ ঘরে পরবাসী' হয়েছে— এই ধারণাটি ক্রমশ 'মিথ'-এ পরিণত হচ্ছিল। সেই বিদ্বেষের দিনে বাঙালি গোপালকৃষ্ণ অসমিয়া-বাঙালির মিলনক্ষেত্র তৈরি করতে চাইছেন নিজে অসমিয়া সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং অসমিয়া ভাষা-সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে— এটা কম গৌরবের কথা নয়। সরকারি উকিল কালীচরণ সেনও এ-ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। কালীচরণের প্রতি অসমিয়া সমাজের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এমন ছিল যে তাঁর কাছেই তাঁরা টাকা-পয়সা জমা রাখতেন। অর্থাৎ কালীচরণ নিজেই এক জীবন্ত ব্যাংক ছিলেন। তাঁকে বলা হত অসমিয়া মানুষের ব্যাংক।[১৭] সেকালের পরিস্থিতিতে এ-সব কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কালীচরণ ও তদানীন্তন সরকারি উকিল দীননাথ সেনের চেষ্টায় গৌহাটি মিউনিসিপ্যালিটির তরফে শুক্রেশ্বরে সংস্কৃত টোল স্থাপিত হল। সম্পাদক দীননাথ সেন। মাসিক ৩০ টাকা বেতনে আনানো হল পণ্ডিত ধীরেশ্বরাচার্যকে। সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা হল একটি ধর্মসভা। গুয়াহাটির দেওয়ানি সেরেস্তাদার ললিতমোহন বাগচী, মুন্সেফ শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, কালীচরণ সেন প্রমুখের প্রচেষ্টায় এ-সব হচ্ছিল।[১৮] যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে পরবর্তীকালে (১ জুন, ১৯১০) ধীরেশ্বরাচার্য 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেছিলেন তিনি গুয়াহাটির বাংলাভাষী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তথা সংস্কৃতিমনস্ক লেখক প্রকাশচন্দ্র সিংহ।[১৯] বাঙালি সমাজের প্রতিনিধিবর্গ সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বার্থে অসমিয়া সমাজের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করছিলেন তখন। হাতে তুলে নিচ্ছিলেন নতুন নতুন পরিকল্পনা ও শুরু হচ্ছিল নয়া প্রচেষ্টা।

ইতিমধ্যে অসমের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চার পরিবেশ দানা বেঁধে উঠেছে। উনিশ শতকের শেষ দশকে বিষয়টি সরকারি স্বীকৃতি পেল। এ-প্রসঙ্গে পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামীর জীবনী-

প্রণেতা বেণুধর শর্মা লিখেছেন :

'বঙ্গদেশত বিজলী ছাহাবে জাতি-উপজাতিবিলাকৰ ইতিবৃত্ত লেখিবলৈ যি প্রকাৰে অনুসন্ধান কার্য্য চলাইছিল, সেই প্রকাৰেই অসমতো বুৰঞ্জী আৰু বুৰঞ্জীমূলক সাহিত্যৰ অন্বেষণ কৰিব লাগে বুলি এডোৱার্ড গেইটে হেঁচি ধৰাত তেতিয়াৰ অস্থায়ী চীফ কমিশনাৰ চাৰ জেমচ লায়ালে বঙ্গদেশৰ আৰ্হিৰে অসমতো জাতিতত্ত্ব বিভাগ (এথন'গ্রাফী) এটি পাতিলে; আৰু সেই বিভাগটো পৰিচালনা কৰিবলৈ অনেৰেৰী ডাইৰেকটৰৰ (অধুনুৰা সঞ্চালকৰ) ভাৰ দিলে এডোৱার্ড গেইটক।"[২০]

গেইট সাহেবের অসম-ইতিহাস অনুসন্ধানের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন অসমিয়া পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী। ইনি প্রচুর অসমিয়া ও সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন তখন। অসমের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চার সেই সময়ে হেমচন্দ্র একজন প্রথম শ্রেণির গবেষক। ১৮৯৮-এর ৩১ মার্চ গেইট সাহেব এথনোগ্রাফি ডিরেক্টর হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন পি. আর. টি. গর্ডন। হেমচন্দ্রের প্রাচীন সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের প্রতি প্রবল আসক্তি তখন তুঙ্গে। এ-সব দেখে হেমচন্দ্রকে কামরূপে বদলি করে আনা হল। পদ্মনাথের সঙ্গে হেমচন্দ্র গোস্বামীর যোগাযোগ হল— মণি-কাঞ্চন যোগ। পদ্মনাথের সঙ্গে হেমচন্দ্র গোস্বামীর বন্ধুত্ব একই নেশার সূত্রে। দুজনেই একই পথের যাত্রী।

॥ ছয় ॥

১৯০৯-এ (২ ফাল্গুন, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ) গুয়াহাটির কার্জন হল লাইব্রেরিতে বঙ্গীয় সমাজের একটি সভা আহ্বান করা হয়। এতে উপস্থিত হলেন মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী, উকিল রামদাস ব্রহ্ম, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রকাশচন্দ্র সিংহ, কমিশনার অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট প্রসন্নচন্দ্র দাশগুপ্ত, কটন কলেজিয়েট স্কুলের হেডপণ্ডিত ও হেডমাস্টার যথাক্রমে রামতনু ন্যায়সাংখ্যচঞ্চু ও মহেন্দ্রনাথ দত্ত, কটনের আরবি-ফারসি বিভাগের অধ্যাপক আবদুল্লা আবু সৈয়দ প্রমুখ অনেক গুণীজন। সভাপতি 'অশেষ শাস্ত্রদর্শী জ্ঞানবৃদ্ধ চন্দ্রমোহন গোস্বামী', ইনি সেই সময়ের অসমের বিখ্যাত হেডমাস্টার ছিলেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর আত্মজীবনী 'মোৰ জীৱন-সোঁৱৰণ'-এ অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁর এই পরম শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাইয়ের কথা উল্লেখ করে গেছেন।[২১] ইনি পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়ারও মাষ্টারমশাই ছিলেন।

ওই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী' সভার সভাধ্যক্ষের পদে বৃত হন পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ। কার্য-সম্পাদক : কটনেরই আরেক বিজ্ঞানের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দু'সপ্তাহের মাথায় ১৩ ফাল্গুন ১৩১৫ এর প্রথম অধিবেশন বসে। সেখানে 'নিবেদন' শীর্ষক একটি নিবন্ধ পাঠ করেন সভাধ্যক্ষ পদ্মনাথ। পরিষ্কারভাবে ওই সভার উদ্দেশ্যও ব্যাখ্যা করেন তিনি :

> "এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য আসাম প্রদেশকে বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট সাহিত্য মুখে সবিশেষ পরিচিত করিয়া দেওয়া। আসাম বঙ্গদেশের অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট এবং ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ হইলেও ইহার বিষয় বঙ্গীয় অনেক সাহিত্যসেবী নানারূপ উদ্ভট ও অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার করিয়া ইহাই স্পষ্ট করিয়াছেন যে বঙ্গবাসিগণ এখনও আসামের প্রকৃত তথ্য বিষয়ে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন।
>
> "যে সকল বাঙ্গালী এখানে থাকিয়া আসামের অন্নে পরিপুষ্ট হইতেছে তাহাদের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য যে প্রচলিত কুসংস্কার দূরীভূত করা এবং এতদ্দেশ সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় বঙ্গবাসিবর্গের গোচরীভূত করা।"[২২]

অসমের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাষা-ইতিহাস সম্পর্কে রাজ্যের বাইরে, বিশেষত বঙ্গদেশে বরাবর একটা নেতিবাচক ধারণা, কুসংস্কার ও উন্নাসিকতা যে ছিল সে তো বলাই বাহুল্য। পদ্মনাথ প্রথম থেকেই এ-সবের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন। পাশাপাশি অসমের ইতিহাস তথা সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে অসম সম্পর্কে যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে সারাজীবন রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের (ইং ১৯০৭) বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'আরতি' পত্রিকায় (সম্পাদক : যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) পদ্মনাথ এক নিবন্ধের শুরু করেছেন তাঁর ওই অসম-বিষয়ক ভাবনা দিয়েই :

"ইদানীং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে এবং গোয়ালন্দ ডাকজাহাজ প্রভৃতির কল্যাণে আসাম প্রদেশে যাতায়াত অতিশয় সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে যখন মাত্র মাল জাহাজ ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া আসিত, তখনও আসাম আসা পূর্বাপেক্ষা কিছুটা সুগম হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্বে যখন জলপথে নৌকা এবং স্থলপথে পর্বতভেদী রাস্তা মাত্র গতায়াতের উপায় ছিল তখন আসামে ভিন্নস্থানের লোক আসিতে চাহিত না। যাহারা আসিত তাহারা নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই আসিত; দেশে অনুপায় না হইলে কেহ এখানে আসিত না। একবার আসিলে পথক্লেশ স্মরণ করিয়া এবং স্বদেশের অসচ্ছলতা ইত্যাদি

ভাবিয়া সহজে বড় কেহ ফিরিয়া যাইতে চাহিত না, এইখানেই বিবাহাদি করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত। এই নিমিত্তই বোধহয় প্রবাদ হইয়াছিল, "আসামে আসিলে ভেড়া বনিয়া যায়"।

"যখন অবস্থা এই ছিল, তখন ভাল লোক আসামে আসিয়া ফিরিয়া গিয়া যে আসামের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিবে তাহার সম্ভাবনাও কম ছিল। সুতরাং আসামের ইতিহাস কেহ বড় জানিত না। না জানাটা বড় একটা যে ক্ষতির বিষয় ইহাও কেহ মনে করিত না। ফল কথা আসাম ও ইহার ইতিবৃত্ত বিষয়ে বঙ্গদেশে একটা ঔদাস্য-অবহেলার ভাবই পরিলক্ষিত হইত।

"তখন মা কামাখ্যাই আসামকে বহির্জগতের সঙ্গে কিছুটা জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন।"[২৩]

প্রথমাবধি পদ্মনাথের মনে হয়েছিল বৃহত্তর অসম নানাভাবে অবেহেলিত। বহু ভাষা-উপভাষা, বিচিত্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, দীর্ঘ বর্ণময় ইতিহাস ইত্যাদির যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। এ-জন্য পদ্মনাথ নব উদ্যমে তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসাবে এ-অঞ্চলকেই বেছে নিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন বাঙালি সমাজের গোপালকৃষ্ণ দে, কালীচরণ সেন, মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী প্রমুখ আর পাশাপাশি অসমিয়া সমাজের হেমচন্দ্র গোস্বামী, ধীরেশ্বরাচার্য প্রমুখ। পরবর্তীকালে সূর্যকুমার ভূঞা অসম-ইতিহাস অনুসন্ধানের এই ধারাটিকেই মহাস্রোতে পরিণত করেছিলেন। সূর্যকুমার, বস্তুত, সেই সময়ের এই আন্দোলনেরই ফসল বলাটা অত্যুক্তি হবে না। মনে রাখতে হবে যে সূর্যকুমার তখন সবে কটন কলেজের তরুণ ছাত্র। ১৯০৯-১১ সালে তিনি কটনে ছাত্র ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন পদ্মনাথ সহ কটনের বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদদের। এঁদের কর্মকাণ্ড ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব সূর্যকুমারের উপর গভীরভাবে পড়েছিল। পরবর্তীকালে তাই তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে পদ্মনাথের কথা লিখে গেছেন এভাবে :

> "I read Sanskrit at his feet at the Cotton College. On my joining that institution as a teacher he gave me valuable advice regarding my duties to my colleagues and students. We respected him for his character, and for his steadfast devotion to the cause of historical research."[২৪]

পদ্মনাথের নেতৃত্বে 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'র প্রতিটি বৈঠকে তাই অসম-বিষয়ক ভাবনাই মূলত গুরুত্ব পেতে শুরু করল। নির্দিষ্ট লেখকেরা একের পর এক তুলে আনলেন এতদঞ্চলের মাটি-মানুষকে।

প্রাপ্ত নথি অনুসারে দেখা যায়, ১৩ ফাল্গুন ১৩১৫ থেকে ৪ পৌষ পর্যন্ত মোট আটটি অধিবেশনে লেখকরা যে-সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন সেগুলোর বিষয় বৃহত্তর অসমের নানা দিক। এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উদ্ধার করা যেতে পারে :

ক) 'রাণী জয়মতী' : গোপালকৃষ্ণ দে (১৫ চৈত্র ১৩১৫)
খ) 'বাণ ও শোণিতপুর' : উমেশচন্দ্র দে (১২ বৈশাখ ১৩১৬)
গ) বলবর্মার তাম্রশাসন : ধীরেশ্বরাচার্য (৯ শ্রাবণ ১৩১৬)
ঘ) আসাম ভ্রমণ : পদ্মনাথ ভট্টাচার্য (১৩ ভাদ্র ১৩১৬)
ঙ) আসাম গৌরব চরিতাবলী : গোপালকৃষ্ণ দে (১৩ ভাদ্র ১৩১৬)
চ) অসমীয়া পদ্মপুরাণ : নিশিকান্ত বিশ্বাস (১৭ আশ্বিন ১৩১৬)
ছ) ভীষ্মক ও কুণ্ডিন : দেবনারায়ণ ঘোষ (১২ অগ্রহায়ণ ১৩১৬)
জ) রি-থ্লেন বা খাসিদের সর্পপূজা : প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (৪ পৌষ ১৩১৬)

গুয়াহাটির এই জমজমাট সাহিত্য-আসরে বঙ্গীয় সমাজের সর্বস্তর থেকে যোগদান করেছিলেন উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ। অসমিয়া সমাজের রথীমহারথীরা অনেকেই এর সদস্য ছিলেন; যেমন—ধীরেশ্বরাচার্য, হেমচন্দ্র গোস্বামী, নবীনচন্দ্র বরদলৈ প্রমুখ। এমন-কি দু-একজন সাহেবও এর সদস্য হয়েছিলেন। সভা অনুষ্ঠিত হত কার্জন হল লাইব্রেরির সভাগৃহে। অনারেব্‌ল মানিকচন্দ্র বরুয়াই এর ব্যবস্থা করে দেন। কটন কলেজের প্রিন্সিপাল সুডমার্সন সাহেব কলেজের বেঞ্চ-টুল ইত্যাদি ব্যবহারের ঢালাও অনুমতি দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয় "কলেজ বোর্ডিং-এর ছাত্রগণকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দিষ্ট সময়াতিরিক্ত কালেও সভায় অবস্থানের আদেশ প্রদানপূর্ব্বক ছাত্রদিগকে সভার প্রবন্ধাদি শ্রবণে উৎসাহিত করিয়া সভাকেও সমুৎসাহিত" করেছিলেন ঋষিকল্প সুডমার্সন সাহেব।[২৫]

অসমের ইতিহাস-অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই সভা মজবুত ভিত তৈরি করেছিল বিশ শতকের প্রথমেই। অসমের অতীতকে পদ্মনাথ-সহ কটনের এই প্রণম্য শিক্ষকেরা নানাভাবে বৃহত্তর বঙ্গীয় সমাজের সামনে তুলে ধরতে চাইছিলেন। সভাধ্যক্ষ পদ্মনাথের মুখে তাই শুনি : "এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য আসাম প্রদেশকে বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট সাহিত্য মুখে সবিশেষ পরিচিত করিয়া দেওয়া।" 'প্রধান উদ্দেশ্য' যে কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছিল তা একটি উদাহরণ তুলে ধরলেই বোঝা যাবে। সতী জয়মতীর কাহিনি অসমের মানুষের কাছে আবেগপূর্ণ একটি ঘটনা; এবং জয়মতীর আত্মত্যাগের ইতিহাস শুধু অসমের মধ্যেই

জ্ঞাত ছিল তখন। 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'র এইসব উদারচেতা মানুষের দ্বারা সে-সময়ে বঙ্গদেশে প্রথমবারের মতো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত হয় জয়মতী-কাহিনি। এ-কাজে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন গোপালকৃষ্ণ দে। জয়মতী-বিষয়ক তাঁর লেখা 'ভারত মহিলা'য় প্রকাশিত হয়। পরে সম্ভবত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়ও লিখেছিলেন তিনি।

॥ সাত ॥

ওই সময়ের আরেকটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবনসায়াহ্নে পদ্মনাথ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'কামরূপশাসনাবলী' সম্পাদনা করতে গিয়ে ভূমিকাতে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

'গৌহাটি, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'র চতুর্থ অধিবেশন হয়েছিল ৯ শ্রাবণ ১৩১৬ বঙ্গাব্দে। এ-দিনের সভায় কামাখ্যানিবাসী পণ্ডিত ধীরেশ্বরাচার্য 'বলবর্ম্মার তাম্রশাসন' প্রদর্শন করেন এবং শাসনটি পাঠ করে এর মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেন। তাম্রশাসনটি পাওয়া গিয়েছিল অসমের নগাঁও জেলায়। দু-তিন হাত ঘুরে শাসনটি ধীরেশ্বরাচার্যের হাতে পড়ে এবং তিনি বাংলা ভাষায় এর ইতিহাস ও ব্যাখ্যা সম্যকভাবে তুলে ধরেন সভায়। এ-বিষয়ে পদ্মনাথ তখনও অভিজ্ঞ ছিলেন না। বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভার উক্ত দিনটি থেকেই অসমের প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ে তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। 'কামরূপশাসনাবলী' সম্পাদনা করতে গিয়ে তাই লিখেছেন :

"ইতঃপূর্ব্বে প্রাচীন লিপি পাঠে অভ্যস্ত ছিলাম না; বলবর্ম্মার শাসনখানির আলোচনায় ও বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিল।"[২৬]

এখানে উল্লেখ্য, ধীরেশ্বরাচার্যের কাছ থেকে নিয়ে মহামতি গেইট শাসনটিকে বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. হর্নলি (Dr. Hoernle) শাসনটির সচিত্র অনুবাদ সহ পাঠ প্রকাশ করেন। 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'য় মূল তাম্রশাসনটি হাতের কাছে পেয়ে পদ্মনাথ এ-বিষয়ে উৎসাহিত হন। কেননা, ড. হর্নলির পাঠে ও অনুবাদে তিনি বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি লক্ষ করেছিলেন। পদ্মনাথ সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সপ্তদশ বর্ষ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, ২য় সংখ্যায় 'বলবর্ম্মার তাম্রশাসন' নামে এক নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সেই সময় সভার সক্রিয় সদস্য অসমিয়া পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী ধর্মপালের আরেকটি শাসন উদ্ধার করেন। পদ্মনাথ সেটিরও পাঠ উদ্ধার পূর্বক বঙ্গানুবাদ করে রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩২২/২য় সংখ্যা) প্রকাশ করেন।

প্রকৃতপক্ষে, অসমের প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয় 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'র মধ্য দিয়ে এবং পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ছিলেন এর মূল কাণ্ডারি। পদ্মনাথ কীভাবে এই উদ্ধারপর্বে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে 'কামরূপশাসনাবলী'র ভূমিকায়। সত্যি কথা বলতে-কি, এরই চূড়ান্তরূপ হল 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'। পদ্মনাথের ভাষায়:

"ইতোমধ্যে 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে'র সহিত সম্পর্ক ঘটে—তাহাতে ইহার কার্য্যগণ্ডীর ভিতরে আসামকে ভুক্ত করা হয়। সন ১৩১৮ সালে কামাখ্যাধামে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়—তদুপলক্ষে আসামের প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনার্থ 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' সংস্থাপিত হয়। তাহাতে সংকল্প করা হয়, যে ঐ সমিতির পক্ষে আমি প্রাচীন কামরূপের তৎসময় পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত শাসনগুলির পুনরালোচনা পূর্ব্বক বঙ্গানুবাদ সহ ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া পরিশেষে ঐসকল প্রবন্ধ 'কামরূপশাসনাবলী' নামে গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত করিব।"[২৭]

'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'য় যে-বীজ প্রোথিত হয়েছিল, তিন বছরের মাথায় তা অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমশ মহিরুহে পরিণত হল। 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি', বস্তুত, 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'র অসম-বিষয়ক স্বপ্নেরই বিস্তৃত রূপ।

॥ আট ॥

'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা' থেকে 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'—এই উত্তরণের মধ্যবর্তী পর্যায়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। সেটি হল 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর সঙ্গে অসমের যোগাযোগ। অসমের ইতিহাসে এই যোগকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী বলে চিহ্নিত করা উচিত। এ-বিষয়টি এ-যাবৎ উপেক্ষিত ও প্রায় অনালোচিত হয়েই রয়েছে।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৩ আষাঢ় রংপুরে (বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সভাপতিত্বে 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর শুভারম্ভ হয়। সেই বছরই ১৮ ও ১৯ মাঘ বগুড়া (এটিও বর্তমানে বাংলাদেশে) শহরে এর দ্বিতীয় অধিবেশন

অনুষ্ঠিত হয়। স্মর্তব্য, ওই বছরই (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) ২ ফাল্গুন গুয়াহাটির কার্জন হল লাইব্রেরির সভাগৃহে 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'-র জন্ম হয় এবং প্রথম অধিবেশন বসে ১৩ ফাল্গুন। সময়ের দিক থেকে 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন' ও 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা' সমসাময়িক। ফলে, এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান তথা যোগাযোগ ঘটা স্বাভাবিক। এবং হলও তা-ই। সুযোগ করে দিয়েছিলেন নামনি (lower) অসমের গৌরীপুর রাজবংশের স্বনামধন্য রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া। 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'-র দ্বিতীয় সম্মেলনে রাজাবাহাদুরের প্রেরিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়। রাজা প্রভাতচন্দ্র 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর তৃতীয় অধিবেশন তাঁর গৌরীপুরস্থ রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান।

সেই অনুসারে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জানুআরি (৯ মাঘ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) শনিবার ও ২৩ জানুআরি (১০ মাঘ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) রবিবার গৌরীপুর রাজবাড়ির মহামায়া মন্দির প্রাঙ্গণের নাটমন্দিরে 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। রংপুরের ৩৭, রাজশাহীর ৫, দিনাজপুরের ৩, বগুড়ার ১১, কোচবিহারের ৮, পাবনার ২, কামাখ্যার ১, গুয়াহাটির ৭, গোয়ালপাড়ার ২০, বিজনির ১, গৌরীপুরের ৩০ জন প্রতিনিধি নিয়ে ওই মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা থেকে যোগ দিয়েছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তোফি, বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। গুয়াহাটি থেকে যোগ দিয়েছিলেন কামাখ্যা পাহাড় নিবাসী মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্য এবং পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, গোপালকৃষ্ণ দে, মল্লনারায়ণ দাস, কুমার হংসধর সিংহ চৌধুরী, বিষ্ণুরাম চৌধুরী, মথুরামোহন বরুয়া (তখন 'অ্যাড্‌ভোকেট অব আসাম'-এর সম্পাদক) ও কন্দর্পনারায়ণ বরুয়া। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বয়ং রাজা প্রভাতচন্দ্র। সম্পাদক : রাজবাড়ির দেওয়ান দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী— কবি অমিয় চক্রবর্তীর পিতা।

গৌরীপুররাজ প্রভাতচন্দ্র বরাবর বিদ্যোৎসাহী। জন্মভূমি অসমের সঙ্গে তাঁর যেমন আত্মিক সম্পর্ক তেমনি প্রতিবেশী বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ। গৌরীপুর ভৌগোলিক দিক থেকে অসম-বঙ্গ সীমান্তে বলে উত্তরবঙ্গ-পূর্ববঙ্গ সহ গোটা বঙ্গদেশের সঙ্গে গৌরীপুরের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। অসমের নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রভাতচন্দ্র অগ্রণী ছিলেন । আবার বঙ্গদেশও তাঁর বিদ্যানুরাগের সুফল পেয়েছিল। ১৯০৩-এ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর গৃহনির্মাণ তহবিলে ২০০ টাকা দান করার তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে।[২৮] বঙ্গ ও অসমের নৈকট্যের সন্ধানেই প্রভাতচন্দ্র 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' অসমে অনুষ্ঠিত করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করতে কোনো ত্রুটি রাখতে চাইলেন না তিনি। অসমের তাবড় তাবড় সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর কাছে যেমন তাঁর আমন্ত্রণপত্র গেল, তেমনি সারা বঙ্গদেশেও তিনি চিঠি পাঠালেন। চিঠি এল পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের কাছেও। পদ্মনাথ খুবই আনন্দিত হলেন। কেননা, নানা কারণে তিনি উক্ত সম্মেলন-এর আগের দুই অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেননি। ক'দিন পর পদ্মনাথের কাছে প্রভাতচন্দ্র একটি প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেন। কিন্তু যেদিন গুয়াহাটি থেকে গৌরীপুর রওনা দেওয়ার কথা তার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ১৮ জানুআরি মঙ্গলবার, ১৯১০, ফের একটি টেলিগ্রাম এল পদ্মনাথের কাছে। রাজাবাহাদুর তাঁকে উক্ত সম্মেলন-এর মূল সভাপতি পদের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পদ্মনাথের হাতে একদিন সময়। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগে অবশেষে এরই মধ্যে তাঁকে সভাপতির অভিভাষণ তৈরি করতে হল।

এদিকে, প্রত্যেক সাহিত্য সম্মেলনে সাধারণত যা হয়ে থাকে, এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটল না; অর্থাৎ সাহিত্যিকদের ভ্রমণ। বঙ্গদেশের সাহিত্যিকরা অসমে এসে কামাখ্যা দর্শন করবেন না— এটা কী করে হয়! তাঁদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল : অসমিয়া সাহিত্যিকদের সঙ্গে মত বিনিময়। এই দুই উদ্দেশ্য সামনে রেখে ১৯ জানুআরি বুধবারে বঙ্গীয় সাহিত্যিকরা গুয়াহাটি এসে উপস্থিত হলেন। তখন সবে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে স্থাপিত হয়েছে। আমিনগাঁওয়ে নেমে ফেরিতে পাণ্ডুঘাট। পাণ্ডুঘাটে গুয়াহাটির নেতৃস্থানীয় সরকারি উকিল কালীচরণ সেন, মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী এবং কামাখ্যার পাণ্ডা বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা দলে অতিথিদের সাদরে বরণ করলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের দলে ছিলেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। পাণ্ডুঘাট থেকে তাঁরা সরাসরি কামাখ্যা গেলেন। পাণ্ডা বিষ্ণুপ্রসাদের বাড়িতে ভোজনাদি হল। বিকেলে তাঁরা ভুবনেশ্বরীর চূড়া থেকে নদী-পাহাড়ের কোলে শায়িত মনোরম গুয়াহাটিকে দু-চোখ ভরে দেখলেন।

ওই দিনই সন্ধ্যায় (১৯ জানুআরি, ১৯১০) 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'র দ্বারা অতিথিবর্গকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। কটন কলেজের শিক্ষক-ছাত্র সহ শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত। হল ভরতি। হেমচন্দ্র গোস্বামী, নবীনচন্দ্র বরদলৈ, রায়বাহাদুর ভুবনরাম দাস সহ অসমিয়া সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এদিনের সভায় উপস্থিত থেকে বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। এই বিশেষ সভা সম্পর্কে 'THE BENGALI' কাগজ বেশ বড় রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল। এখানে তার কিয়দংশ উদ্ধার করা যায় :

> "North Bengal Literary Conference
> *Some Delegates' visit to Gauhati.*
> ...A public reception was offered to them by the leading men of Gauhati, in the evening, at the local theatre hall,[২৯] which was fully packed. Pandit Padmanath Bidyabinode, President, Gauhati Literary Society, read a paper welcoming the delegates, and narrating shortly the useful work done by the Society. Babu Ram Das Brahmo, pleader delivered a speech giving interesting historical facts regarding Assam... Babu Banomali Chakraborty, Professor, Cotton college, thanked the delegates for taking the trouble of coming to Gauhati to meet them. A sweet song brought the proceedings to a close. The meeting was a splendid success."[৩০]

রাত্রে মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ীর বাড়িতে জমকালো ডিনার পার্টি হল। মহেন্দ্রমোহনের এই আদি বাড়িটি গুয়াহাটির ফ্যান্সিবাজারে নদীর দিক থেকে শিখমন্দিরে ঢোকার পথের ধারে আজও একই রকম দাঁড়িয়ে আছে। প্রয়াত নীরেন লাহিড়ীর বাসভবনের ভেতর আসাম-টাইপ ঘর সেটি।

জানুআরি ২২ (১৯১০ খ্রি.) শনিবার গৌরীপুর রাজবাড়ির মহামায়া মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হল বহু আকাঙ্ক্ষিত তৃতীয় সম্মেলন। সম্মেলনের কেন্দ্রবিন্দুতে এখন পদ্মনাথ; কেননা তিনিই সভাপতি। ফুল, পাতা ও বিচিত্র পতাকা দ্বারা বিশাল বিশাল তোরণ তৈরি করা হয়েছিল সারা গৌরীপুরে। উৎসবমণ্ডপও সাজানো হয়েছিল দৃষ্টিনন্দন করে। "মহার্ঘ আস্তরণ বিস্তৃত সুরচিত মঞ্চের উপর সভাপতির জন্য সুচারু কারুকার্য্যখচিত রজতাসন সংস্থাপিত করা হয়। হরিদ্বর্ণের লতা পল্লবরচিত সুরম্য স্তম্ভ সংন্যস্ত বিচিত্র আলেখ্যাবলী সভার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিতেছিল।"

সকাল ন'টায় রৌপ্যদণ্ড সংযুক্ত লোহিতবর্ণের রেশমি পতাকাধারী বিশাল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত সভাপতি পদ্মনাথকে সঙ্গে নিয়ে সভাস্থলে প্রবেশ করলেন রাজা প্রভাতচন্দ্র। ধীরেশ্বরাচার্যের সংস্কৃত শ্লোক, মৌলবি মোহাম্মদ আব্দুল হালিম সাহেবের কোরান, বরদাকান্ত বিদ্যারত্নের দুর্গাস্তোত্র ইত্যাদি পাঠ, কলকাতার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত উদ্‌বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে সভা আরম্ভ হল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রাজা প্রভাতচন্দ্র স্বাগত ভাষণে বললেন :

'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে কত লুপ্তরত্নের উদ্ধার হইয়াছে ও হইতেছে...। তাই সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গে এত গৌরব ও আদরের জিনিষ। শুধু বঙ্গের বলিয়াই বা বলি কেন? ভারতেরও গৌরবের জিনিষ। এই পরিষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আসামেও নানা স্থানে স্থানে প্রাচীন লুপ্তরত্নের উদ্ধার ও ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহার্থ তুল্য সমিতি গঠিত হইলে দেশের ও জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।'[৩১]

গৌরীপুররাজের ভাষণে একটি ব্যাপার খুবই স্পষ্ট যে, তিনি চেয়েছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর মডেলে অসমেও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক। এই ভাবনারই চূড়ান্ত রূপ 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'। প্রকৃতপক্ষে, এই ভাবনাটি সর্বাগ্রে পদ্মনাথ সহ গুয়াহাটির বঙ্গীয় সমাজের নেতাদের মনেই এসেছিল। এবং সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তাঁরা গুয়াহাটিতে কাজ শুরু করেছিলেন। আর সে-উদ্দেশ্যেরই ফলশ্রুতি 'গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'। গুয়াহাটিতে আগমনকারী বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের সামনে পদ্মনাথ বলেছিলেন : "ইহাকে ['গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'-কে] কালে পরিষদের [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের] একতম শাখারূপে পরিগণিত করিবারও সংকল্প আছে।" এই সংকল্প যে অচিরেই কার্যকর হয়েছিল সেটা বোঝা যাবে এই তথ্যটি থেকে : পরিষদের ৮ নং শাখা রূপে স্বীকৃতি পায় 'গৌহাটী শাখা'। কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমোদনের তারিখটি হল : ১০ কার্তিক ১৩১৮। সুতরাং 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর 'গৌহাটী শাখা'র প্রতিষ্ঠাকাল ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

১৩১৮ বঙ্গাব্দ মানে ইংরেজি ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ। অর্থাৎ 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর গৌরীপুর অধিবেশনের একবছরের মধ্যেই রাজা প্রভাতচন্দ্রের স্বপ্নের প্রাথমিক বাস্তবায়ন

শুরু হয়েছিল পদ্মনাথ প্রমুখের কার্যাবলির মধ্য দিয়ে। তবে একটি ব্যাপার অনুমান করতে দ্বিধা নেই, সেটি হল : পদ্মনাথ বুঝেছিলেন যে কেবল 'বঙ্গীয়' অভিধায় ভূষিত হলে এতদঞ্চলে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করা অসম্ভব। এ-জন্য 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর গুয়াহাটি শাখাকে স্বতন্ত্র রেখেই নতুন করে পরের বছরই অর্থাৎ ১৯১২-তে 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' গঠন করেন এঁরা। তাপর্যপূর্ণ কথা হল, কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয় 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর কামাখ্যাতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম অধিবেশনে। সাহিত্য-পরিষদের গুয়াহাটি শাখার দীর্ঘ ইতিহাস এর পরের কাহিনি। ১৯৩১-এ 'কামরূপশাসনাবলী'র ভূমিকায় পদ্মনাথ লিখেছিলেন : "বর্ত্তমানেও ইহা ['গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা'] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটি শাখারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।' এই উজ্জ্বল শাখাটি আজ কালগর্ভে বিলীন বটে, কিন্তু কয়েক দশক আগেও স্বমহিমায় উদ্ভাসিত ছিল। যতদূর জানা যায়, এই শাখার সর্বশেষ সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এবং সম্পাদক ছিলেন গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. দীপক সেন। ষাটের দশকের ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য অস্থিরতা এই শাখাটিকে চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছে।

যা হোক, সভাপতির ভাষণে পদ্মনাথ দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, তখন অসমিয়া-বাঙালির ভাষা সমস্যা নতুন মোড় নিচ্ছে গোয়ালপাড়া জেলাকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথের 'ভাষাবিচ্ছেদ' নামক বিতর্কিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়ে গেছে। পদ্মনাথ এক অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। বলা যেতে পারে পদ্মনাথের এই বক্তব্যটি নিয়ে অসমিয়া সমাজে ঝড় উঠেছিল। কী বলেছিলেন পদ্মনাথ সেদিন? সমন্বয়ের কোনো বাণীই কি তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি? তাহলে অধিবেশনের শেষপর্বে তিনি যা বলেছিলেন তা পরখ করা যাক—

"আমার অভিভাষণ আকর্ণনানন্তর কোনও কোনও আসামবাসী মহাশয়ের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, আমরা বুঝি অসমীয়া ভাষা তুলিয়া দিয়া তৎস্থলে বঙ্গ ভাষা চালাইবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক, তাহা বলাই বাহুল্য। মৎপঠিত অভিভাষণে এবং অসমীয়া প্রবন্ধে ঈদৃশ আশঙ্কার পরিপোষক কোনও কথাই নাই। আমি স্পষ্ট করিয়া পুনরপি বলিতেছি যে, অসমীয়া যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহারা তাহা ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। তবে ভাষাটি যাহাতে সংস্কৃতানুসারী হয়, উহাই বাঞ্ছনীয়। যেন আমরা (বঙ্গভাষিগণ) তাহা অক্লেশে বুঝিতে পারি, যেন আমরা অসমীয়া সাহিত্য হইতে আসামের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকার্য্যে অনায়াসে সাহায্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হই।" [৩২]

অসমিয়া ভাষার প্রতি পদ্মনাথের প্রকৃত শ্রদ্ধা যে ছিল উপর্যুক্ত বক্তব্যই তার প্রমাণ।

এখানে উল্লেখ্য যে, পদ্মনাথের ওই ভাষণ প্রবল বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। স্বয়ং লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া এই ভাষণের কড়া সমালোচনা করেছিলেন। 'অসমীয়া গৌৰীপুৰত বঙলা সাহিত্য সভা' নামে তা বেরিয়েছিল 'বাঁহী' ১ম বছর ৯ম-১২শ সংখ্যায়। লক্ষ্মীনাথ একে বাঙালি-সম্প্রসারণবাদী চিন্তা রূপেই গণ্য করেছিলেন। লক্ষ্মীনাথের সমালোচনার পর অসমিয়া জাতীয়-জীবন থেকে পদ্মনাথের অবদান একেবারে মুছে ফেলা হয়। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা। কেননা, পদ্মনাথের সমস্ত জীবনের মূল অধ্যয়ন-ক্ষেত্র ছিল অসম। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্ট অংশে পদ্মনাথের রচনার একটা তালিকা দিয়েছি। এই তালিকা থেকে অনায়াসে বুঝতে পারা যাবে, পদ্মনাথের মধ্যে অসম-প্রাণতা কী ধরনের ছিল। পদ্মনাথের প্রতি এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট অবিচার হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। পদ্মনাথ-লক্ষ্মীনাথ বিতর্ক এক বিশাল অধ্যায়। আপাতত সে-বিষয়ে গেলাম না।

॥ নয় ॥

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ যে অসম সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে মূল প্রস্তাবক ছিলেন তা সম্প্রতি নতুনভাবে আমাদের গোচরে এসেছে। অসম সাহিত্য সভার ভূতপূর্ব সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ-বিষয়ে যা লিখেছেন তা হুবহু তুলে ধরছি—

> পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সম্পর্কে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৰা সমালোচনাৰ পিছত আজিকোপতি এটা সন্দেহ আৰু অবিশ্বাসৰ ভাব দেখা যায়— সঁচায়ে তেনে আছিল নেকি তেওঁ? কিন্তু পদ্মনাথৰ অন্য এটা দিশো বোধকৰোঁ সামান্য হ'লেও অৱহেলিত। 'কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতি'ৰ প্রতিষ্ঠাতা, কামৰূপ শাসনাৱলীৰ প্রণেতা পদ্মনাথে অসম সাহিত্য সভাৰ প্রতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্রত এটা উল্লেখনীয় ভূমিকা যে পালন কৰিছিল— সেই কথা বিভিন্ন অসমীয়া বৰেণ্য সাহিত্যিকে লিখি থৈ গৈছে। অতুল চন্দ্র বৰুৱা প্রণীত শৰৎচন্দ্র গোস্বামী নামৰ জীৱনীগ্রন্থত এনে তথ্য পোৱা যায়। সাহিত্যাচার্য অতুলচন্দ্র হাজৰিকাই অসম সাহিত্য সভা ৰূপৰেখা (পৃষ্ঠা ১৪) গ্রন্থত 'অসম সাহিত্য সভা স্থাপনৰ পূর্ববঙ্গ' শিতানত লিখিছে :

"সেই উপলক্ষে যোৰহাটলৈ যোৱা অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ মুখিয়াল লোকসকলে বিষ্ণুৰাম হলত গোটখাই এখন অসমীয়া সাহিত্য সভা... পাতিবলৈ কুৰুংকাৰাং কৰিছিল। মেঘে গাজিলে, কিন্তু বৰষুণ নহ'ল। সেই চনতে গুৱাহাটীৰ অঃ ভাঃ উঃ সাঃ সভাৰ এক বৈঠকত অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ে 'অসম সাহিত্য সন্মিলন' এখন গঠন কৰি তাৰ পৰা 'বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলন'লৈ প্রতিনিধি পঠাবৰ বাবেও এটা প্রস্তাৱ দিছিল। পিছে, ঘাইকৈ প্রধান সাহিত্যিকসকলৰ বিৰোধিতাত সেই প্রস্তাৱো ফুটুকাৰ যেন হৈ উৰি গ'ল।"

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদৰ এই সদর্থক ভূমিকাৰ বিষয়ে ৰত্নকান্ত বৰকাকতীয়েও লিখিছে—

"১৯১৫ খৃষ্টাব্দৰ জুলাই মাহত মই কটন কলেজৰ প্রথম বার্ষিকত ভর্ত্তি হওঁ। তাৰ অলপ আগতে কটন কলেজৰ সংস্কৃতৰ প্রফেছৰ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ৰ অনুগ্রহত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দত বর্দ্ধমানৰ বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনলৈ ময়ো হেমচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রনাথ শর্মা আৰু সর্বেশ্বৰ কটকীৰে সৈতে 'হাফ কনচেছ্ন' টিকতত ডেলিগে'ট হিচাবে যাবলৈ সুবিধা পাওঁ। সেই বর্দ্ধমান সাহিত্য সন্মিলন দর্শনৰ ফলতে মই, চন্দ্রনাথ শর্মা আৰু অম্বিকা ৰায়চৌধুৰী— এই তিনিজনৰ যুটীয়া যত্নৰ ফলতে অসম সাহিত্য সন্মিলনৰো জন্ম হ'ল বুলিব লাগে। আমাৰ কল্পনা-গর্ভস্থ অসম সাহিত্য সভা শিৱসাগৰত পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত ১৯১৭ চনত ভূমিষ্ঠ হ'ল।" (ৰত্নকান্ত বৰকাকতী গদ্যসম্ভাৰ— আত্মবাণী)[৩৩]

॥ দশ ॥

'কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতি' প্রকৃতপক্ষে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের মানস-সন্তান এবং তিনিই সেই নমস্য ব্যক্তি যিনি সর্বাগ্রে অসমে এ-রকম একটা সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এবং সেই অনুসারে তিনি 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর পঞ্চম অধিবেশন দেবীতীর্থ কামাখ্যায় অনুষ্ঠিত করার পরিকল্পনা করেন। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ৭-৮ এপ্রিল (২৪-২৫ চৈত্র, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ) এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'-র জন্ম। পদ্মনাথ সেই সমিতির অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন। মোট বারোজন সদস্যকে নিয়ে প্রথম 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' গঠিত হয়। এর মধ্যে ধীরেশ্বরাচার্য, পদ্মনাথ, হেমচন্দ্র গোস্বামী, কালীচরণ সেন, লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ দে প্রমুখ ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী সময়ে এই সমিতি বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর গুয়াহাটি শাখার বড় কোনো পদে পদ্মনাথকে আমরা দেখিনি।

১৯০৫ থেকে ১৯২৩—এই সময়সীমা হচ্ছে কটন কলেজে পদ্মনাথের কর্মজীবন তথা গুয়াহাটিবাস। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি থেকে অসম সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পদ্মনাথ অসমের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু এ-ছাড়া তিনি ব্যক্তিগত গবেষণা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাতেই মূলত মনোনিবেশ করেছিলেন। আমাদের অনুমান, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার তীব্র সমালোচনার পর অসমিয়া সমাজে পদ্মনাথের অবস্থানটি ক্রমশ টলতে থাকে। পদ্মনাথও নিজেকে গুটিয়ে নেন। ১৯১৭-তে অসম সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠা হলে অসমিয়া জাতীয়তাবাদী ধারাটির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু অসমকেন্দ্রিক এত বড় মাপের গবেষকের সেখানে কোনো বিশেষ স্থান ছিল না। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে 'জনশক্তি' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ) 'কি দুঃখে আসাম থাকিব?' নামে একটি নিবন্ধ লেখেন পদ্মনাথ। নাম থেকেই বিষয় অনুমেয়।

১৯২৩-এর ৫ সেপ্টেম্বর পদ্মনাথ চাকরি-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তার আগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য স্মর্তব্য।

ক. ১৯১২-তে তিনি দরবার মেডেল দ্বারা সম্মানিত হন এবং কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর অধিবেশনে বিশেষ সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

খ. ১৯১২-র জানুআরিতে ঢাকা সারস্বত সমাজ-এর বিশাল অধিবেশনে তিনি অসমিয়া পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে যোগ দেন।[৩৪]

গ. ১৯২২-এ তিনি 'মহাহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন।

পদ্মনাথ গুয়াহাটি থাকাকালীনই ১৯১৯-এ রবীন্দ্রনাথ অসম-ভ্রমণে এসে এই শহরে তিন-তিনটি দিন অতিবাহিত করেন। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করেন। এমন-কি পদ্মনাথের হাতে-গড়া 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' গুয়াহাটি শাখা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হন, কটন কলেজের ছাত্র-শিক্ষকের দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেন, কিন্তু পদ্মনাথ কোনো কিছুতেই উপস্থিত ছিলেন না। বিষয়টি আশ্চর্যের যদিও ড. উষারঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর 'নীল-সোনালির বাণী'-তে জানিয়েছেন : বরাবর রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও দর্শনের বিপরীতে

ছিল পদ্মনাথের অবস্থান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর উদ্যোগে কবির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতার টাউন হল-এ যে-সংবর্ধনার (২৮ জানুআরি ১৯১২) আয়োজন করা হয়, সেই অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে পরিষদকে চিঠি লিখেছিলেন পদ্মনাথ। এ-ছাড়াও 'স্যার রবীন্দ্রনাথ বনাম চিত্তরঞ্জন', 'রবীন্দ্রনাথের দুইটি উপন্যাস' ইত্যাদি রচনায় শাণিত সমালোচনা করেছিলেন পদ্মনাথ।[৩৫]

॥ এগারো ॥

চাকরি থেকে অবসরের পরে পদ্মনাথ সপরিবারে কাশীধামে বসবাস শুরু করেন। পদ্মনাথের পারিবারিক দুই-একটি তথ্য দিই। তাঁর প্রথম পত্নী চন্দ্রপ্রভার অকালমৃত্যু হলে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন বসন্তকুমারীকে (১৩০৪ বঙ্গাব্দ)। ১৯৩৫-এ বসন্তকুমারীর মৃত্যুর পরে তিনি কাশীধাম ছেড়ে জন্ম-গ্রাম বানিয়াচঙে পাকাপাকি চলে আসেন। ১৯৩৮-এর ৩০ অক্টোবর বেলা ৪টায় এখানেই তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

পদ্মনাথের এই প্রবাসযাত্রা বিষয়টি আমাদের খুব বিস্মিত করে। কেননা যে-মানুষটি ইচ্ছে করলেই কলকাতা বা ঢাকায় তাঁর অবশিষ্ট সারস্বত-জীবন কাটাতে পারতেন তিনি সুদূরে পাড়ি দিলেন কেন? এমন-কি গুয়াহাটিও তাঁকে ধরে রাখতে পারল না।

এর দুটি কারণ আমরা অনুমান করি। প্রথমত, পদ্মনাথ অত্যন্ত স্বাভিমানী ছিলেন, এই অভিমান তাঁকে নিজের মতো করে চলতে শিখিয়েছে। বিদ্যাচর্চা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেননি। তিনি যা সত্য বলে মনে করেছেন, তা-ই গ্রহণ করেছেন। যতীন্দ্রমোহন কয়েকটি তথ্য দিয়েছেন।[৩৬] যেমন—

১. ১৯২৩-এ কোচবিহারের রাজশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।
২. ১৯২৪-এ শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণ পরিষদ-এর বার্ষিক সভার সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মতি।
৩. ১৯২৪-এ আসাম শিক্ষক সম্মিলনীর সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান।
৪. ১৯২৫-এ বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনীর দর্শন শাখার সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান।
৫. ১৯২৭-এ আসাম সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পদ অস্বীকার।
৬. ১৯২৮-এ আবার আসাম সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পদ অস্বীকার।
৭. ১৯২৮-এ ত্রিপুরার রাজ্যাভিষেকের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।
৮. ১৯২৮-এ মথুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের পদ প্রত্যাখ্যান।
৯. অখিল ভারতবর্ষীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ প্রত্যাখ্যান।

সামগ্রিকভাবে পদ্মনাথ অসমের জন্য অনেক করেও সেভাবে স্বীকৃতি পাননি, বরং সমালোচনায় জেরবার হয়েছিলেন। অসম ছেড়ে যাওয়ার এটাই সবচেয়ে বড় কারণ বলে মনে হয়।

এই তো গেল এক দিক। দ্বিতীয় দিকটি হল, পদ্মনাথ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে তা রক্ষণশীলতার পরিচয়ও বহন করত। বিশিষ্ট অসমিয়া সাহিত্যিক অতুলচন্দ্র হাজরিকা পদ্মনাথের সরাসরি ছাত্র ছিলেন কটন কলেজে। পদ্মনাথকে ছাত্ররা যে অসম্ভব শ্রদ্ধা ও সমীহ করত তা তাঁর লেখা থেকে জানা যায়। পদ্মনাথ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

> 'এই মানুগৰাকী আছিল খোনা, বিদগ্ধ পণ্ডিত, নিকপকপীয়া সনাতনী আৰু নমো নমো পাৰিজাত। পৰাপক্ষত তেওঁ তথাকথিত মেলেছবিলাকক জ্ঞাতসাৰে স্পর্শ নকৰিছিল আৰু কলেজৰ পৰা গৈ গা-মূৰ তিয়াই আৰু সম্ভবতঃ তাৰ লগে লগে শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ কৰি গাটো শুচি কৰি লৈছিল। ...বিদ্যাবিনোদে হেনো জামাতুল্লাৰ দোকানৰ পৰা পাওঁকটি খোৱাৰ বাবে নিজৰ পুতেককো ত্যাজ্য পুত্র কৰিছিল আৰু পুতেকৰ এনে অধৰ্মী কার্যত লাই দিয়াৰ বাবে যৈণীয়েক ল'ৰাৰ মাককো ঘৰৰ পৰা বাহিৰ উলিয়াই দি উগ্রশাস্তি বিহিছিল। সেয়ে হলেও মানুহজন আছিল সাত্ত্বিক, বিদ্বান, ছাত্রবৎসল আৰু স্বদেশানুৰাগী।' [৩৭]

এ-সব হয়তো খানিকটা অতিরঞ্জিত। কিন্তু পদ্মনাথ যে তাঁর জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন, তা এ-জাতীয় তথ্য থেকে প্রমাণিত। সুতরাং একটি বিষয় অনুমান করা যায় যে, মহাতীর্থ কাশীতে ধর্মাচরণের উপযুক্ত পরিবেশ পাবেন মনে করেই তিনি সব ছেড়ে কাশীবাসী হন। সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্র হিসাবেও কাশীকে তাঁর মনে ধরেছিল। তা ছাড়া পদ্মনাথ অবসর যাপনে নীরবে অধ্যয়ন-গবেষণাও চালিয়েছিলেন। তাঁর রচিত অসম ইতিহাসের মহৎ গ্রন্থ 'কামরূপ-

শাসনাবলী' কাশী থাকাকালীন প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, যে-'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' তাঁর মানস-সন্তান স্বরূপ এবং যে-সমিতির পক্ষে তিনি এই গবেষণা-কর্মটি করেছিলেন, সেই সমিতি কিন্তু বইটি প্রকাশ করেনি। করেছিল 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ'। 'কামরূপশাসনাবলী'-র ভূমিকায় তাই পদ্মনাথ খানিকটা আক্ষেপের সুরেই লিখেছেন—

"...যে 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'র পক্ষ হইতে শাসনাবলী সঙ্কলিত করিতে প্রবৃত্ত হই; পরন্তু ঐ সমিতি কোনও কারণে স্বয়ং ইহার প্রকাশভার গ্রহণ করিতে পারেন নাই।" [৩৮]

কিন্তু কেন? লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার আক্রমণের পরবর্তী রেশ? আমরা জানি না।

॥ বারো ॥

পদ্মনাথ বিভিন্ন সংস্কার কর্ম তথা উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার দু-একটি উদাহরণ দিয়ে এই আলোচনা শেষ করছি।

১. পদ্মনাথের সম্পাদনায় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে (১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে) 'গৌহাটি বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা' দ্বারা 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি এবং হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদানবিধি' প্রকাশিত হয়।

২. ওই বছরই অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' প্রকাশিত হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই গ্রন্থের অন্তরালে পদ্মনাথের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তিনি তখনকার দিনে ৪,৫০০ টাকা ব্যয় করে সেটি প্রকাশও করেন।

৩. আমার পিতামহ প্রয়াত কীর্তিচরণ গিরির সংগ্রহ থেকে পদ্যে রচিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতা' নামে একটি খণ্ডিত গ্রন্থ পেয়েছি। লেখক—শ্রীহট্টের রমেশচন্দ্র দেবশর্মা। এটি প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। এই গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রেও পদ্মনাথ অর্থ ব্যয় করেছিলেন।

৪. ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জে, বিশেষত বানিয়াচঙে প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষের ত্রাণে পদ্মনাথ মুক্তহস্তে দান করেন।

৫. তখন শ্রীহট্টে 'খাটেধরা' নামে এক প্রথা ছিল। শ্রীশচন্দ্র লিখেছেন—

"অতি প্রাচীন কাল হইতেই শ্রীহট্ট জেলায়, বিশেষত সুপ্রাচীন বানিয়াচঙ্গ গ্রামে বিবাহবাসরে কাষ্ঠাসনে উঠাইয়া সপ্ত প্রদক্ষিণ সম্পাদনের প্রথা ছিল। ইহাই গ্রাম্য ভাষায় খাটেধরা নামে অভিহিত। বরের খাটে চারিজন ও কন্যার খাটে চারিজনে ধরার নিয়ম ছিল এবং এই কার্য্য একটা বিশেষ শ্রেণীর লোক দ্বারা সম্পাদিত হইত যাহারা সমাজে স্বভাবতই হেয় বলিয়া গণ্য হইত...।" [৩৯] পদ্মনাথ এই প্রথা বিলোপ করেন। এ-জন্য তাঁকে বহু প্রতিকূলতাও সহ্য করতে হয়েছে।

৫. পদ্মনাথ অত্যন্ত ছাত্র-বৎসল ছিলেন। গরিব দুস্থ ছাত্রদের জন্য সারা জীবন অকাতরে অর্থ দান করে গেছেন।

আক্ষেপের বিষয়, অসমের ইতিহাস থেকে এই রকম একজন কর্মযোগী পণ্ডিতের অবদান প্রায় মুছে ফেলা হয়েছে। তাঁকে আর তেমনভাবে স্মরণই করা হয় না। এমন-কি কয়েক বছর আগে, ২০০১-এ, কটন কলেজের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। পদ্মনাথের নামে কটন কলেজের কোনো একটি ভবন উৎসর্গ করা যেত; করা হয়নি। পদ্মনাথ আজ একটি বিস্মৃতপ্রায় নাম!

তবুও সুখের কথা, পদ্মনাথের উত্তরপুরুষ কবি রমানাথ ভট্টাচার্য ও তাঁর পরিবার এই মহান পণ্ডিতকে আবার আলোর বৃত্তে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁদের সাধুবাদ জানাই।❑

তথ্যসূত্র :

১. 'The Journal of the Assam Research Society', Vol-I, No.-I. April 1933. Edited by Kanaklal Baruah. 'Introduction'.

২. **'পদ্মনাথ ভট্টাচার্য'**, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। সাহিত্য-সাধক চরিতমালা। দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০৫, পৃ. ৫।

৩. তদেব। পৃ. ৬।

৪. **'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস'**, মদনমোহন কুমার, সম্পাদক, 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ', প্রথম প্রকাশ ১৩৮১, পৃ. ১৫৮।

৫. মুখবন্ধ, **'প্রবন্ধাষ্টক'**, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, প্রথম প্রকাশ ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

৬. **'শোকসিন্ধু'**, শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯, ২৫ ফেব্রুআরি। পৃ. ১৫।

৭. **'পদ্মনাথ ভট্টাচার্য'**, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। পৃ. ৯।

৮. **'শোকসিন্ধু'**, শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃ. ১৫-১৬।

৯. History of Services of Gazetted and other Officers serving under the Government of Assam. Corrected to 1st July, 1923. Page 293.

১০. '**বিবেকানন্দ চরিত**', সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, চতুর্থ সং, আষাঢ় ১৩৪৩, পৃ.৫০৫।

১১. '**আসামে বিবেকানন্দ**',পুনর্মুদ্রণ, 'একা এবং কয়েকজন', ১৪০৬, পৃ. ১৮।

১২. "এবাৰ স্বামী বিৱেকানন্দ গুৱাহাটীলৈ অহাত, চহৰবাসী ভদ্রলোকসকলে তেওঁক অভ্যর্থনা কৰিবলৈ এখন সভা পাতিছিল। সেই সভাত আমাৰ পূজ্যপাদ কৰিৰত্ন-দেৱো উপস্থিত আছিল। স্বামীজীয়ে সভাত বক্তৃতা দিলত, আমাৰ আচার্যদেৱে হঠাৎ থিয় দি স্বামীজীৰ সংস্কৃত কথাত দুটা নে এটা ভুল ধৰিলে। দেউৰ তেনেকুৱা মূৰ্ত্তি দেখি, ভদ্রলোকসকলে দেউক বহিবলৈ অনুৰোধ কৰিলত, স্বামীজীয়েও ভুলটো স্বীকাৰ কৰি কলে যে,— 'তেওঁৰ সংস্কৃত কোৱা অভ্যাস বেচি নাই।' " —'মহামহোপাধ্যায় ঁধীৰেশ্বৰাচাৰ্য্য— কৰিৰত্নদেৱৰ জীৱনচৰিত', কামাখ্যাচৰণ ভট্টাচাৰ্য ব্যাকৰণশাস্ত্রী, প্রথম সং ১৯২৮, পৃ. ৫৫। [পদ্মনাথের লেখায় ঘটনাটি আছে যদিও স্বামীজির ভুল ধীরেশ্বরাচার্য ধরেছিলেন—এমন তথ্য নেই।]

১৩. '**আসামে বিবেকানন্দ**',পুনর্মুদ্রণ, 'একা এবং কয়েকজন', ১৪০৬, পৃ. ২১।

১৪. সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৫০৬।

১৫. **মঞ্চুলেখা,** অতুলচন্দ্র হাজরিকা। প্রথম সং ১৯৬৭, পৃ. ৪৬৩।

১৬. তথ্যটি মহেন্দ্রমোহনের নাতি প্রয়াত আইনজীবী নীরেন্দ্রমোহন লাহিড়ীর কাছ থেকে পাওয়া।

১৭. **ইতিহাসৰ ছাঁ-পোহৰত পুৰণি গুৱাহাটী**, কুমুদেশ্বর হাজরিকা, পৃ. ৩০-৩১।

১৮. '**ধীৰেশ্বৰাচাৰ্যৰ জীৱনচৰিত**', পৃ. ৪৯-৫০।

১৯. **তদেব**, পৃ. ৭১।

২০. **অসমীয়া সাহিত্যৰ পৰমাচাৰ্য্য পণ্ডিত গোস্বামী**, বেণুধৰ শৰ্মা। প্রথম প্রকাশ, ১৯৭২, পৃ. ৫০।

২১. **মোৰ জীৱন-সোঁৱৰণ**, দ্বিতীয় সং, পৃ. ৪৪।

২২. **কার্যবিবরণ**, 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন', প্রথমভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৪-৯৭।

২৩. *'পূর্ণানন্দ গিরি ও কামাখ্যা মহাপীঠ'*, পুনর্মুদ্রণ, '**প্রবন্ধাষ্টক**', পৃ. ৯৬-৯৭।

২৪. 'Men I have met' by S. K. Bhuyan. 1st Edition 1962, P. 25-26।

২৫. **কার্যবিবরণ**, 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন', প্রথম ভাগ, পৃ. ১০১।

২৬. ভূমিকা, **কামৰূপশাসনাবলী**, প্রথম সং, ১৯৩১।

২৭. **তদেব**।

২৮. **পরিষদ-পরিচয়**, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৬ কার্তিক, সংকলক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৭।

২৯. এখানে 'আর্যনাট্য সমাজ'-এর কথা বলা হচ্ছে।

৩০. 'The Bengalee'; Calcatta, January 21, 1910 A.D. Vol-LI, No. 19।

৩১. **কার্যবিবরণ**, 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন', প্রথমভাগ, পৃ. ১৪-১৫।

৩২. **তদেব**, পৃ. ৬১-৬২।

৩৩. **সাতসৰী**, ৰাগ-অনুৰাগ-১, বিশেষ সংখ্যা। ডিসেম্বর, ২০০৭, পৃ.২০।

৩৪. **ধীৰেশ্বৰাচাৰ্যৰ জীৱনচৰিত**, পৃ.৯৩।

৩৫. **নীল-সোনালির বাণী**, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, পৃ. ৫৬-৫৮।

৩৬. **পদ্মনাথ ভট্টাচার্য**, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃ. ১৬।

৩৭. **স্মৃতিৰ পাপৰি**, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭, পৃ. ৪৭।

৩৮. ভূমিকা, **কামৰূপশাসনাবলী**, প্রথম সং, ১৯৩১।

৩৯. '**শোকসিন্ধু**', শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. ২১।

পরিশিষ্ট

অসম-বিষয়ক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের কিছু রচনা—

১. *পূর্ণানন্দ গিরি ও কামাখ্যা মহাপীঠ*। 'আরতি' (১৩১৪ বৈশাখ)।

২. *অসমীয়া ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা*। 'আসাম বান্ধব', ১ম বর্ষ।

৩. *কামরূপ শাসনাবলী : ভাস্কর বর্মার তাম্রশাসন*। 'কার্যবিবরণী; উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন' (১৯২০ খ্রি.)

৪. *শ্রীহট্টে পণ্ডিতা রামাবাই*। 'কমলা' (১৩১১ পৌষ)।

৫. *গোপালকৃষ্ণ দে*। 'কমলা' (১৩৩২ ভাদ্র)।

৬. *কামরূপ রাজাবলী*। 'কমলা' (১৩৩২ অগ্রহায়ণ-পৌষ)।

৭. *কি দুঃখে আসাম থাকিব?* 'জনশক্তি' (১৩৩৫ অগ্রহায়ণ)।

৮. *মহাপুরুষীয়া সম্পদায়*। 'ঢাকা রিভিউ' (১৩১৮ আষাঢ়)।

৯. *ভাস্কর বর্মার তাম্রশাসন —ভাস্কর বর্মার নষ্টকল্পনা*। 'নবযুগ' (১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ)।

১০. *আসামে বঙ্গ সাহিত্য চর্চা*। 'নব্যভারত' (১৩২৬ ফাল্গুন)।

১১. *কামরূপে কোচরাজ কীর্তি*। 'পরিচারিকা' (১৩২৮ আশ্বিন)।

১২. *গোসাই ও ভকত*। 'প্রতিভা' (১৩২০ জ্যৈষ্ঠ)।
১৩. *আহোম আকবর রুদ্রসিংহ*। 'প্রতিভা' (১৩২১ পৌষ)।
১৪. *আসাম রাজের বাঙ্গালী গুরু*। 'প্রতিভা' (১৩২৩ ভাদ্র)।
১৫. *ভাস্কর বর্মা ও ভিনসেন্ট স্মিথ*। 'প্রতিভা' (১৩২৮ অগ্রহায়ণ)।
১৬. *বল্লভদেবের তাম্রশাসন*। 'প্রতিভা' (১৩৩৩ শ্রাবণ-চৈত্র)।
১৭. *হর্জ্জরদেবের তেজপুরস্থ পাষাণ গাত্র লিপি*। 'প্রতিভা' (১৩৩৪ কার্তিক-চৈত্র)।
১৮. *হর্জ্জরদেবের তাম্রশাসনের মধ্য ফলক*। 'প্রতিভা' (১৩৩৫ বৈশাখ-চৈত্র)।
১৯. *পরশুরাম কুণ্ড*। 'বঙ্গবাসী' (১৩৩০ পৌষ)।
২০. *কাছাড়ের বিক্রমপুর*। 'বিক্রমপুর' (১৩২৪ বৈশাখ)।
২১. *আসামে বিবেকানন্দ*। 'মর্যাদা' (হিন্দি) (...)।
২২. *অসমীয়া ভাষার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা*। 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' (১৩১৭)।
২৩. *অসমীয়া গ্রন্থবিবরণী*। 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' (১৩১৮)।
২৪. *ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন*। 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' (১৩১৯)।
২৫. *বনমালদেবের তাম্রশাসন*। 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' (১৩২১)।

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস-এর জীবন ও সাহিত্য

শ্যামসুন্দর বসু

এক বিস্ময়কর কিংবদন্তিপ্রতিম ভূপর্যটকের নাম রামনাথ বিশ্বাস। কর্মকে যোগ হিসেবে গ্রহণ করে দুর্দমনীয় জিদ্দিবাজ রামনাথ সেই সময় দুই বাংলার মানুষের হৃদয়ে তুলেছিলেন ঝোড়ো উন্মাদনা। আমাদের 'ভেতো বাঙালি' বা 'ঘরকুনো' অপবাদকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে প্রায় অন্ধকার যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগে দুঃসাহসী বাঙালি বীর সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণ (১৯৩১-১৯৪০) করেছিলেন— চেয়েছিলেন, পৃথিবী ও তার হাজারো রকম মানুষের সঙ্গে 'জান পহচান' করে জানিয়ে যাবেন নিজের দেশের মানুষকে; বিশেষ করে টগবগে উৎসাহ জোগাবেন যুবসমাজকে। মনে রাখতে হবে, তিনি যাত্রা শুরুই করেছিলেন কোনোরকম টাকাপয়সা সঙ্গে না-নিয়ে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে। যা আজকের 'স্পনসরসিপ'-এর যুগে ভাবাই যায় না। এমন দাপুটে হিম্মত 'কোটিকে গুটিক' হয় বলেই-না তিনি চিরস্মরণীয়। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে দার্শনিক বেজহট-এর অবিস্মরণীয় উক্তি— "The greatest pleasure in life lies in doing what people say you cannot do." সেই কাজটি করেই পাওয়া যায় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ, যেটার জন্য সাধারণ মানুষ বলে, এটা করা সম্ভব নয়।

এ-হেন মহান মানুষটির জন্ম ২৩শে চৈত্র, রবিবার, বাংলা ১৩০০ সালে। বাবা বিরজানাথ ছিলেন কাত্যায়ন গোত্রীয় গোঁড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ। বর্ধিষ্ণু বনেদি বংশ। শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলার হবিগঞ্জ সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত বানিয়াচঙের রাজবংশের সন্তান। বিদ্যাভূষণ পাড়া। প্রথমে টাইফয়েড ও পরে কলেরায় 'রামা'র শিশুজীবন ছিল বড়ই বেহাল। বয়স পাঁচ পেরিয়ে গেল, অথচ লেখাপড়া শুরুই হল না। দেখতে দেখতে আটের দরজায় পৌঁছে কোনোরকমে আরম্ভ হয় লেখাপড়া। বাবা-মা দুজনেই ক্রমে ক্রমে মারা গেছেন। রামনাথ মানুষ হতে থাকেন দাদা-বউদির কাছে। গোঁড়া প্রাচীনপন্থী পরিবারে জন্মেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্তমনের মানুষ। তাই কোনো ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠানে রামনাথের প্রবেশ ছিল নিয়ন্ত্রিত। ফলে, বেপরোয়া রামনাথকে

বাড়িতে ও পাড়ায় মাঝে-মধ্যেই একঘরে অবস্থায় থাকতে হত। সে-জন্যই তাঁকে অনেক সময় রাত কাটাতে হয়েছে গাছতলায় শুয়ে।

ব্যতিক্রমধর্মী মানুষেরা সমাজের বহমান ফাঁকিগুলি কেমন যেন সহজাত গুণে ধরে ফেলেন। রামনাথও এগুলি শনাক্ত করে ফেলতেন অতি সহজেই। ধর্মের আড়ালেই হোক কিংবা শাসনের বেড়াজালেই ঘটুক, মানুষের প্রতি কোনোরকমের বঞ্চনা একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। জীবনের শুরু থেকেই ছিলেন স্বাধীনচেতা ও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। যেন খাপখোলা এক ঝকমকে তলোয়ার। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময়েই যোগ দিয়েছিলেন বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির সুশীল সেনের শাখায়। রামনাথকে পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই পুষ্ট হয়ে উঠেছিল সেই শাখা, আপন স্বাতন্ত্র্যে। এই সময় ইংরেজ সরকার একটি আইনের বলে পতিত জমির ওপর খাজনা ধার্য করলে রামনাথ গ্রামের সবাইকে একজোট করে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত চলে। শেষ পর্যন্ত রায় গ্রামবাসীদের পক্ষে গেলে 'রামা'র জয়জয়কার পড়ে যায়। এরপর শুরু হয় স্কুলে স্কুলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছাত্র ধর্মঘট, যার নেতৃত্বে ছিলেন রামনাথ।

১৯১৪ সালে শুরু হল রামনাথের বিচিত্র এক জীবন। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যে বাঙালি পল্টন ও লেবার কোর গঠন করা হয়, তাতে তিনি যোগ দেন অফিসের বড়বাবু হিসেবে। কিন্তু অসুস্থতার কারণে, শরীরের ওজন নিয়ম অনুযায়ী ১০০ পাউন্ডের কম হয়ে যাওয়ায়, 'জিসচার্জড' হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। অথচ চুপচাপ বসে থাকা তাঁর ধাতে ছিল না। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সেনা বিভাগের জন্য কেরানি ও অফিসার স্কুলের ট্রেনিং-এ যোগ দেন 'কুমটি'তে। ১৯১৮ থেকে শুরু তাঁর পরোক্ষ পর্যটন। কেননা ট্রেনিঙের পর সেনা জীবনের চাকরির সুবাদে সুদূর আফগানিস্তান, পারস্য ও বেলুচিস্তান পর্যন্ত ঘুরতে হয়েছিল। তবে এই চাকরির কঠোর নিয়ানুবর্তিতার চাপে পড়ে মুক্ত বিহঙ্গ রামনাথ হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ম্যালেরিয়ায় কাহিল হয়ে চাকরি ছেড়ে বাড়ি ফিরে এলেন। তাহলেও এমন মানুষটির কাছে সে আর ক'দিন? বাইরের ডাক যাঁর অন্তরে বেজে চলে ঘড়ির কাঁটার মতো টিক্‌টিক করে, তাঁকে কি ঘরে বেঁধে রাখা যায়! বের হতেই হবে ঠিকঠিক। এ-ছাড়া সংসারের দায়দায়িত্বও কিছুটা তো চেপেছে ঘাড়ে। কোনোরকমে সুস্থ হয়ে বেরিয়ে পড়লেন, সেই বছরেই মালয় দেশের সিঙ্গাপুরে কাজ নিলেন জাহাজি আদালতে ত্রিভাষী (ইংরেজি-চিনা-মালয়) সুপারভাইজার হিসেবে।

সিঙ্গাপুরে চাকরি রামনাথের জীবনে এক চরম সন্ধিক্ষণ। এমনিতেই রামনাথের মন ছিল বিপ্লবী তারে বাঁধা। তার ওপরে বাসায় গৌরীশ চন্দ্র সিংহরায়-এর মতো বিপ্লবীরা একে একে আসা-যাওয়া শুরু করেন। এঁরা ছিলেন পাঞ্জাবের যতীন চাটুজ্যের 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'-এর 'আন্ডারগ্রাউন্ড' সদস্য। 'যুগান্তর' দলের সঙ্গেও ছিল এঁদের যোগাযোগ। গৌরীশচন্দ্র ১৯২৬ সাল থেকেই রামনাথকে বিশ্বপর্যটনে বেরিয়ে পড়তে উৎসাহিত করছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, ভূপর্যটনের পথে-পথে রামনাথ যেন পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী দলের রাষ্ট্রদূত রূপে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারেন। অজয় নামে গৌরীশের এক শাকরেদ পুলিশকে খবর দিয়ে এল— রামবাবু হেন-তেন ভাবে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত। ব্যস, সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় ও অর্থসাহায্য করার অপরাধে চাকরি চলে গেল। মানসিক প্রস্তুতি চলতে থাকল সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণের। কিন্তু নতুন লোক না-পাওয়া পর্যন্ত এক মাস অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এর পর তিন মাস পুরো বেতনে ছুটি কাটিয়ে তবে মুক্তি। রেজিগনেশন জমা দেওয়ার দিন কুড়ি পর, একদিন বেলা এগারোটায় অন ডিউটিতে দেখেন, মেরিন কোর্টের কাঠগড়ায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্পেনের দুই যুবক। বিনা টিকিটে ও বিনা পাসপোর্টে ভ্রমণের দায়ে অভিযুক্ত। বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা হেলায় বললেন— "আমাদের পয়সা নেই যে টিকিট কেটে পৃথিবী ভ্রমণ করতে পারি। স্থলপথে না-হয় হেঁটে যাওয়া যায়, কিন্তু জলপথে অন্য উপায় কী? আর পাসপোর্ট আমরা পাই না এ-জন্য যে, আমরা সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী। কিন্তু ভ্রমণের অধিকার তো মানুষের জন্মগত। পৃথিবী ভ্রমণ না-করলে এ-জন্মই নিরর্থক।" যেটুকু-বা উৎসাহ-উদ্দীপনার বাকি ছিল, এই চাক্ষুষ ঘটনার পর তা বেড়ে গেল দাউদাউ তেজে।

৭ জুলাই ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ। যাত্রা শুরু সিঙ্গাপুরের কুইন স্ট্রিটের বাঙালি মসজিদ থেকে, দুপুর দুটোয়। বেলা একটার সময় কুইন স্ট্রিটে গিয়ে উপস্থিত হলেন একটি সাইকেল নিয়ে। সঙ্গে একটি খদ্দরের চাদর আর মশারি। পোশাক একটা, যেটা পরে আছেন। টাকাকড়ি সঙ্গে কিছুই নিলেন না। সত্যিই পাসপোর্ট ছাড়া সেদিন তাঁর সম্বল ছিল শুধুই দৃপ্ত সংকল্প এবং অনমনীয় মনোবল। অজস্র মানুষের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে চাকা দুটি চালিয়ে দিলেন পৃথিবীর পথে।

প্রথমে এলেন মালয়ের রাজধানী কুয়ালালামপুরে। ক্রমে

জিত্রা, চিয়াংলুং-এর ধুলো উড়িয়ে শ্যামল মাটির শ্যামদেশে অর্থাৎ তাইল্যান্ডে। সেখান থেকে ইন্দোচিন ও চিনে। হংকং-ক্যান্টন-নানকিন-সাংহাই হয়ে পিকিং (বর্তমান বেজিং)। দু-চাকায় চলার পথে তাঁর সবচাইতে প্রিয় দেশ চিন। তিন-তিনবার ঘুরেফিরে এসেছেন। মনে রাখতে হবে— জীবনের শুরু থেকে তিনি আস্তিক হলেও ভ্রমণের মধ্যগগনে মাও-সে-তুঙের আগুনখেকো প্রভাবে হয়ে ওঠেন রীতিমতো নাস্তিক। পিকিং ঘুরে মাঞ্চুকো, মুকদেন ও সীমান্তশহর আন্তং হয়ে ঢুকে পড়লেন কোরিয়ায়। তারপর জাহাজে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে জাপানে পৌঁছলেন। জাপান পরিক্রমা শেষ করে অতলান্তিক পেরিয়ে আমেরিকায় যেতে চাইলেন তিনি। বাধা পেলেন কানাডায়। ইমিগ্রেশন বিভাগ তাঁকে বন্দি করে জেলে পাঠাল। কেননা ও-দেশের তখন নিয়ম, নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিলে তবে কানাডায় থাকা ও ঘোরার অনুমতি পাওয়া যায়। কিন্তু ভবঘুরের পকেট যে তখন গড়ের মাঠ। তাই শাস্তি হিসেবে থাকতে হল ভারকোডার জেলে ২৯ দিন। কানাডা সরকার ৩০ দিনের দিন 'হিয়েমারু' নামে একটি জাপানি জাহাজে করে তাঁকে পাঠিয়ে দেয় জাপানে। কিন্তু জাপান বন্দরও তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়নি। চারদিন পর তাঁকে ঠেলে দেওয়া হয় চিনের বন্দর সাংহাইতে।

অসম্ভব জেদ ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি যাঁর মূলধন, আমেরিকা বা জাপান সরকার সেই রামনাথকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি বেশিদিন। পরবর্তীকালে সময়-সুযোগ মতো সে-দেশগুলির সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং দেখেছেন তন্নতন্ন করে। আপন প্রজ্ঞার আলোকে করে গেছেন অন্তর্তদন্ত।

জাপান বন্দরে বাধা পেয়ে ঝটিতি আবার চিনের কিছু অংশ ঘুরে নিয়ে পাড়ি জমালেন ফিলিপাইন, বালি, সুরাবায়া, জাভা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে। তাঁর একরোখা মনোভাবের জন্য জাভার ডাচ সরকার তাঁকে বন্দি করে সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দেয়। একমাস পরে সিঙ্গাপুর থেকে পিনাং ছুঁয়ে মারগুঁই বন্দর হয়ে ঢোকেন বর্মা (মায়ানমার) মুলুকে। এরপর ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত অঞ্চল দেখে চলে যান আফগানিস্তান, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন হয়ে তুরস্কে।

তুরস্কের পর ইউরোপ মহাদেশ, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মানি, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স। সীমাহীন কষ্ট, সহিষ্ণুতা ও ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে এক-একটি দেশ অতিক্রম করেছেন আর তিল তিল করে উপলব্ধি করেছেন যুদ্ধজয়ের অনুভূতি ও অন্তর্লীন আনন্দ।

এর পর ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে পৌঁছলেন ইংল্যান্ডে। কিন্তু শেষ সম্বল কয়েকটি মাত্র পেনি জলখাবার খেতেই শেষ হয়ে যায়। ওদিকে ইস্ট এন্ডে ঘর ভাড়া করে ফেলেছেন। পরপর দু'দিন অভুক্ত। বিশ্ব পর্যটনে এমনটি হয়েছে তাঁর বারবার। এ-যাত্রায় সিলেটের এক ভদ্রলোকের সাহায্যে রক্ষা পান কোনোক্রমে। অনেক সময় বিভিন্ন ভাষায় লেখা 'ট্যুর'পথের বিবরণ তথা সাহায্যপত্র দেখিয়ে মানুষের কাছে অর্থসাহায্য চাইতে হয়েছে। বাধ্য হয়ে এমনটি করতে গিয়ে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন— "এ কাজ ছিল সাইকেল ভ্রমণ অপেক্ষা কঠিন।"

অতঃপর ব্রিটেন ও স্কটল্যান্ড ঘুরে আয়ার্ল্যান্ডে যাচ্ছেন। এমন সময় অমানুষিক পরিশ্রমের দরুন শরীর ভেঙে পড়ল। ঠিক করলেন, ভারতে ফিরে আসবেন। সাইকেল নিয়ে জাহাজে উঠে বসলেন।

কিন্তু মাত্র দু'মাস বিশ্রাম নিয়েই হাঁপিয়ে-ওঠা ভ্রামণিক আবার বেরিয়ে পড়লেন বিশ্ব ভ্রমণের পাঞ্জা কষতে। এবার আফ্রিকা মহাদেশ। উত্তর আফ্রিকার কেনিয়া, উগান্ডা, টাঙ্গানাইকা, নয়াসাল্যান্ড-সহ রোডেশিয়া ছুঁয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল, নাটাল এবং কেপরাজ্য সফর করলেন।

এর পর গেলেন সেই বহুকাঙ্ক্ষিত দেশ আমেরিকায়। যেখানে গোড়ায় শুধু বাধা, অপমান আর তিরস্কার জুটেছিল। হয়তো-বা ছিল ভাবী পুরস্কারের ভিত্তিভূমি। দু'চোখ ভরে দেশটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখলেন, তৃতীয় নেত্রের মেলবন্ধনে। লিখলেন সার্থকতম বই 'আজকের আমেরিকা'।

কোন্ সেই যুগে কল্পনাতীতভাবে নিজেকে নিংড়ে দিয়ে, তিন দফায় প্রায় ৮৭ হাজার মাইল পরিক্রমা করে, বিশ্বজোড়া অভিজ্ঞতার পরমানন্দ বুকে নিয়ে 'গ্লোবট্রটার'মশাই কলকাতায় ফিরে থিতু হলেন ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে। যেমন নিঃসম্বল অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছিলেন একদিন, ফিরেও এলেন তেমনই কপর্দকহীন অবস্থায়। যোগের খাতায় রইল শুধু মানুষের দেওয়া আখ্যা— ভূপর্যটক। চির-উজ্জ্বল ধ্রুবতারার মতো।

মানুষ রামনাথও ওই ধ্রুবতারার মতোই প্রোজ্জ্বল। যেমন সৎ তেমনই আদর্শবাদী। ন্যায়-নীতি ছিল জীবনের অঙ্গ। ঘৃণা করতেন দ্বিচারিতা। সম্মান করতেন মাতৃজাতিকে। প্রথাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটাই ছিল তাঁর স্বভাব। অন্যায় দেখলেই তাঁর হাত-পা নিশপিশ করত, প্রতিবাদও করতেন সেভাবেই। প্রয়োজনে ঝলসে উঠতেন। ফুটে উঠত তাঁর

তেজস্বিতা। আবার ঠিক উলটোদিকে, মানুষের প্রয়োজনে ও আপদে-বিপদে নিজেকে বিলিয়ে দিতেন উজাড় করে। ছেচল্লিশের সেই ভয়ংকর দাঙ্গায় হিন্দুদের যেমন দু'হাত দিয়ে আগলেছেন, মুসলমানদেরও তেমনই সামলেছেন বুক দিয়ে। জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে বাইরেটা আপাতকঠিন মনে হলেও, হৃদয়টি ছিল বড়ই কোমল। পরের দুঃখকে আপন করে নিতে এমন দিলখোলা মানুষ অত্যন্ত দুর্লভ। ধর্মের গোঁড়ামি, কু-প্রথা, অন্ধ সংস্কার ও মানুষে-মানুষে বিভেদের বিরুদ্ধে বরাবরই তিনি সোচ্চার এবং খড়্গহস্ত ছিলেন। খানিকটা জাপানির মতো দেখতে, গাঁট্টাগোট্টা এই দুঃসাহসী বাঙালি বীরের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব ছিল যুবসমাজকে উদ্‌বুদ্ধ করা। অলস কিংবা ভেঙে-পড়া যে-কোনো যুবকের মধ্যে জীবনীশক্তির বিদ্যুৎ তরঙ্গ চালিত করার মন্ত্র ছিল তাঁর অনায়াস করায়ত্ত। বাংলার যুবসমাজকে ভ্রমণ ও দেশাত্মবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে বলতেন, "জগৎ ও জীবনকে হাতেকলমে যাচাইয়া দেখুন। বিদেশের সঞ্চয় আনিয়া দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করুন।" সত্যি বলতে-কি, তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই যৌবনের পূজারি।

অথচ, পথিকৃৎ এমন মহৎ মানুষটি যোগ্য স্বীকৃতি আর পেলেন কই? প্রাপ্তির খাতায়— জীবনের শেষ প্রান্তে প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য কিছু সরকারি বৃত্তি আর মধ্য কলকাতায় শেয়ালদার কাছে তাঁর নামে একটি রাস্তা। হলওয়েল লেনের নাম বদলে রাখা হয়েছে 'রামনাথ বিশ্বাস লেন'।

আশ্চর্য মানুষ এই রামনাথ। বুদ্ধি, সাহস বা গায়ের জোর, কমতি ছিল না কোনোটারই। চিনে একবার ভয়ানক ডাকাতদের হাতে পড়লেও কিচ্ছুটি তারা কেড়ে নিয়ে যেতে পারেনি। বরং নিজেরাই তাঁকে কিছু দিয়ে গিয়েছিল। এ যে দেখি উলটো পুরাণ! পিকিং-এর পথে হোটেলে ঢুকতে গিয়ে দেখেন জাপানি এক চর একটি চিনা যুবককে চাবুক মারছে নির্দয়ভাবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়ালেন। চরটি রামনাথকে চাবুক মারতে গেলে তৎক্ষণাৎ সেটি কেড়ে নিয়ে তাকেই দু'চার ঘা বসিয়ে দিলেন। কখনো কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। সিঙ্গাপুর, বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন সময়ে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কেউ তাঁকে অপমান করলে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়েছেন তার মোক্ষম জবাব। যেন মূর্তিমান বিদ্রোহী।

অন্যদিকে, যে-দেশে গেছেন সেই দেশের সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর মন ভালোবাসায় ব্যাকুল হয়ে উঠত। আর্তজনদের জন্য কেঁদে উঠত তাঁর ব্যথিত হৃদয়। আফ্রিকায় রওনা হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, "দেখো রামনাথ, নিগ্রো চরিত্রে যা ভালো দেখবে তা-ই বয়ে নিয়ে আসবে।" কিন্তু নিদারুণ বঞ্চিত ও অত্যাচারিত নিগ্রোদের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভগ্নহৃদয়ে তিনি লিখেছিলেন— "নিগ্রো চরিত্রে কী আর ভাল দেখব? মনিব থেকে গোলাম পর্যন্ত সবাই নিগ্রো নির্যাতনে পরম উৎসুক।"

আফ্রিকায় জঙ্গলের পথে হাঁটছেন। সঙ্গে তিন জন নিগ্রো। হঠাৎ তাদেরই একজনের পায়ে বিষাক্ত কাঁটা ফুটল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কাতর আবেদন জানায়— "আমাদের ফেলে রেখে পালাবে না তো বাবু?" রামনাথ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন— "বলে দে তারু (বয়স্ক নিগ্রোটির নাম), আমি ইউরোপিয়ান নই, ভারতীয় ব্যবসায়ীও নই। আমি তোদের মতোই মানুষ। একে ফেলে আমি কোথাও যাব না।" এখানেই রামনাথ ব্যতিক্রমী। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই পালিয়ে বাঁচার স্বার্থ দেখেননি। মনুষ্যত্বই ছিল তাঁর চরিত্রের বড় গুণ। সেইসঙ্গে যোগ হয়েছিল প্রখর ব্যক্তিত্ব। আফ্রিকা ভ্রমণ শেষে জাহাজে চড়েছেন, বিলেত ঘুরে যাবেন আমেরিকায়। লক্ষ্য করে দেখলেন, জাহাজে সাদা চামড়ার লোকেরা ছাড়া অন্যরা ভয়ে কেমন যেন কেঁচো হয়ে আছেন। অথচ এশিয়ার লোকেদের মধ্যে সেই জাহাজে জাপানি ও তুর্কিদেরই দাপট। বুক ফুলিয়ে হাঁটছেন রামনাথ। এক সাহেব তাঁকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রশ্ন ছুড়লেন— "তুই কি প্যাসেঞ্জার?" রামনাথের তুরন্ত জবাব— "হ্যাঁ রে, তোর মতোই।" জাহাজের অন্য যাত্রীরা তারপর নির্ভয়ে চলাফেরা করতে লাগল।

ছেলেবেলা থেকেই দুঃসাহসী হওয়ার ফলে জীবনে যেমন অনেক বিপদ থেকে সহজে উদ্ধার পেয়েছেন, তেমনই আবার বিপদ ডেকেও এনেছেন বারবার। বেশ কয়েকটি দেশে পুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। মারও খেয়েছেন অনেক বার। তিনি দেখতে ছিলেন কিছুটা জাপানিদের মতো। সাংহাই-এর পথে নিংপো গ্রামে একটি পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন, এক চিনা সৈনিক 'জাঁপ্পুন কুই' (জাপানি ভূত) বলে তাঁকে ঘুসি মারলে তিনিও পালটা এক মোক্ষম ঘুসি ঝাড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো একটা ব্যাটেলিয়ন এসে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে রামনাথ জ্ঞান হারান। সেবার সেরে উঠতে পুরো দু'মাস সময়

লেগেছিল।

সুবিশাল অভিযাত্রায় মানবদরদি কতবার যে তাঁর পকেটের শেষ কপর্দকটি দিয়েও নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছেন তার লেখাজোখা নেই। কত মানুষকে যে নীরবে গোপনে সাহায্য করে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। নিজের আর্থিক অনটনের মধ্যেও দেখা যেত, মানুষের দুঃসময়ে তিনি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ঠোঙায় করে খাবার এনে কোনো-না-কোনো অভুক্ত মুখে তুলে দিচ্ছেন। মনুষ্যত্বই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

মনে রাখতে হবে, তিনি যে-সময় ভূপর্যটন করেছেন, সেই প্রায় অন্ধকার যুগে বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ছিল অস্থির। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যাতায়াতের পথ ছিল অতীব দুর্গম। তাঁকে যে সীমাহীন কষ্ট করে ঘুরতে হয়েছে তা প্রযুক্তিনির্ভর আজকের পৃথিবীতে বসে কল্পনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং ঘরছাড়া সবরকম ছেলেমেয়ের কাছেই রামনাথ হতে পারেন যথার্থ পথিকৃৎ। তাঁর দেশ ছিল সারা বিশ্ব। পথের টানে তিনি ভবঘুরে হতে পেরেছিলেন বলেই পৃথিবীর সব দেশে পেয়েছিলেন প্রাণভরা আদর ও ভালোবাসা।

রামনাথের সাহিত্য

দু-চাকায় ভর করে ভুবন ভ্রমণকালে সীমাহীন ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন রামনাথ। সেইসঙ্গে চোখ দুটিকে করে নিয়েছিলেন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দূরবিন। এরই লেন্সের মাধ্যমে যাবতীয় মানুষ ও বিষয়-ঘটনার অন্তস্তল পর্যন্ত এক লহমায় পড়ে নিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারতেন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। যার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন লেখায়। গড়িয়ে-যাওয়া সাইকেলের দুটি চাকা চোখের স্বচ্ছ দুটি লেন্সের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমুদ্রবিশাল ভাণ্ডার প্রকাশ পেয়েছে রামনাথের সাহিত্যে।

বিশ্বাসমশাই শুধু নিজেই ভূপর্যটন করেননি, সাহিত্যের মাধ্যমে অসংখ্য পাঠককে দুনিয়া ঘুরিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন তাঁর চোখ দিয়ে। নিজস্ব ঢঙে এবং নিজস্ব রঙে। এই সমস্ত বইয়ের সিংহভাগ ভ্রমণ বিষয়ক হলেও গল্প ও উপন্যাস রচনাতেও তাঁর দক্ষতার আর-এক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিক থেকেই ভ্রমণ কাহিনি লিখতে থাকেন বিক্ষিপ্তভাবে। এই সময়ে বিভিন্ন পত্রিকার দরজায় দরজায় নানা দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ লেখাগুলি নিয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে হয় তাঁকে। অবশেষে সে-লেখা নিজস্ব পত্রিকায় স্থান দিয়ে প্রথম সম্মান দেন 'প্রবর্তক'-এর রাধারমণ চৌধুরী। পুরোধা প্রবর্তক-এর সূত্র ধরে যে-উৎসাহের সূচনা হল তা নবতর উদ্যমে বেড়ে চলে। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাতে ভাটা পড়েনি। ক্রমে 'দেশ', 'বসুমতী', 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি পত্রিকায় ব্যাপক হারে লেখা বের হতে থাকে। সে-সময় বিশেষ করে মানসিক ভ্রমণপিপাসু বাঙালি পাঠক উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করত তাঁর বিস্ময়কর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ লেখাগুলির জন্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য। পর্যটনশেষে ১৯৪০ সালে কলকাতায় থিতু হয়েই মন দিলেন বই লেখায়। বয়স তখন সাতচল্লিশ। বিচ্ছিন্ন লেখাগুলি জড়ো করে বাড়তি কিছু সংযোজন ঘটিয়ে কলমের ডগায় আনলেন ঝড়ের গতি। সেই ঝোড়ো হওয়ায় পাল তুলে একে একে ভেসে এল ভ্রমণের বজরা, গল্পের নৌকা ও উপন্যাসের পানসি।

প্রকাশিত ভ্রমণের বইগুলি যথাক্রমে : ১) তরুণ তুর্কী (১৯৪১), মোট চারটি সংস্করণ বের হয়, মূল্য ২.০০ টাকা; ২) মরণবিজয়ী চীন (১৯৪১), তাঁর সবচাইতে প্রিয় বই, মূল্য ৬.০০ টাকা; ৩) Africa in Picture (১৯৪১); ৪) আজকের আমেরিকা (১৯৪১), তাঁর সবচাইতে জনপ্রিয় বই, ছয়টি সংস্করণই নিঃশেষিত হয়ে যায়, মূল্য ৩.৫০ টাকা; ৫) কোরিয়া ভ্রমণ (১৯৪২), মোট তিনটি সংস্করণ ছাপা হয়; ৬) আধুনিক ভূ-পরিচয় (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টেক্সটবুক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য লিখিত ভূগোল পাঠ্যপুস্তক। রামনাথ বিশ্বাস এবং হাওড়া মধুসূদন পালচৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূগোল শিক্ষক বিজয় রতন বক্সী কর্তৃক যুগ্মভাবে লিখিত। মূল্য এক টাকা দুই আনা, অর্থাৎ এখনকার এক টাকা বারো পয়সা); ৭) আফগানিস্তান ভ্রমণ; ৮) লাল চীন; ৯) China defies Death; ১০) বেদুইনের দেশে; ১১) ভয়ঙ্কর আফ্রিকা; ১২) Tour round the World without Money; ১৩) ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর; ১৪) জুজুৎসু জাপান; ১৫) প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তি; ১৬) পারস্য ভ্রমণ; ১৭) বিদ্রোহী বলকান; ১৮) পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ; ১৯) জার্মানি এবং মধ্য ইউরোপ; ২০) মালয়েশিয়া ভ্রমণ কাহিনী; ২১) মুক্ত মহাচীন; ২২) দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা; ২৩) নিগ্রো জাতির নূতন জীবন; ২৪) ভবঘুরের বিলাতযাত্রা; ২৫) ভবঘুরের বিশ্বভ্রমণ; ২৬) সর্বস্বাধীন শ্যাম; ২৭) অন্ধকারের আফ্রিকা; ২৮) পৃথিবীর পথে (এটি 'একপাতে রামনাথ' গোছের, মোট দশটি বইয়ের সংকলন গ্রন্থ, মূল্য ৪.০০ টাকা); ২৯)

ফ্রান্সে ভারতীয় ভূপর্যটক; ৩০) ব্রহ্মদেশে ছয়মাস; ৩১) রামনাথ গ্রন্থাবলী (১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বিখ্যাত বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত পাঁচটি নির্বাচিত বইয়ের সংকলন, মূল্য ৪.০০ টাকা); ৩২) ভারত ভ্রমণ।

তাঁর লেখা গল্পের বই মোট তিনটি : ১) ভবঘুরের গল্পের ঝুলি; ২) মাউ মাউ-এর দেশে; ৩) ভবঘুরের ভীনদেশী বন্ধু।

উপন্যাস পাওয়া গেছে পাঁচটি : ১) আগুনের আলো; ২) হলিয়ুডের আত্মকথা; ৩) সাগর পারের ওপারে; ৪) আমেরিকান নিগ্রো; ৫) নাবিক।

এ-ছাড়া পাঁচটি বইয়ের যন্ত্রস্থ বিজ্ঞাপন পাওয়া গেছে, যেগুলির প্রকাশ সম্ভবত আদৌ হয়ে ওঠেনি : ১) ইরাণের আর্য; ২) ভ্রমণের শেষ; ৩) বিলাত ভ্রমণ; ৪) এশিয়ার ফ্রান্স; ৫) পৃথিবীর বেটারলেন্ড।

রামনাথের প্রথম দিকের বইগুলি সেই সময়ে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে। বিশেষ করে 'তরুণ তুর্কী', 'আজকের আমেরিকা', 'মরণবিজয়ী চীন' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত ও পুনঃপ্রকাশিত হয়ে নিঃশেষ হতে থাকে, ক্রমশ। অবিভক্ত সমগ্র বাংলা জুড়ে আপামর জনসাধারণের নয়নের মণি হয়ে ওঠেন রামনাথ। তাঁর অতুলনীয় অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ আলোকরাশির ছটায় নিজেদের রাঙিয়ে নিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে মানুষজন— বাংলার ঘরে ঘরে।

রামনাথের প্রথম জীবন যদি শৈশব ও কৈশোর হয়, তাহলে মেনে নিতে অসুবিধে নেই, দ্বিতীয় জীবন হচ্ছে ভবঘুরের। সেক্ষেত্রে তৃতীয় জীবন হবে অবশ্যই সাহিত্য-জীবন।

বিশ্বপথিক নিজ গুণেই প্রচার পেয়ে যাচ্ছেন দিগ্‌বিদিকে। তা দেখে কলকাতার এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের মালিক অধস্তনদের চাপা আদেশের স্বরে বলেছেন— 'ছোটলোক ছেলেটাকে পাবলিসিটি বেশি দেবেন না।' এ-কথা নিজের কানে শুনে, বহু পরিচিত বন্ধুদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন তিনি, স্থায়ী ঘা-এর যন্ত্রণা বয়ে। তখনকার উন্নাসিক সাহিত্যিক মহলেও একটা কথা চালু ছিল, "রামনাথ ভূপর্যটক ঠিকই, কিন্তু তাঁহার পক্ষে লেখনী ধারণ করা বাতুলতা মাত্র।" খ্যাতনামা ভ্রমণ-সাহিত্যিক প্রবোধ কুমার সান্যাল একবার রসিকতা করে বলেছিলেন— "তুমি তো পা দিয়ে লেখ হে।"

তাহলে তাঁর লেখাপড়ার জগতে সাধ্যমতো উঁকিঝুঁকি দেওয়া যাক। এ-কথা ঠিক, পর্যটন নিয়ে লেখার শুরুতে যা ছিল তা আদৌ সাহিত্য-গুণসম্পন্ন ছিল না। কখনো লেখার অভ্যেস নেই। অথচ সসাগরা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে অভিজ্ঞতার অমৃতকুম্ভ উপচে পড়ছে। স্বাভাবিক ভাবেই জলোচ্ছ্বাসের মতো সব কিছুই যেন কালির আঁচড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। রচনাশৈলীগত পারিপাট্যের অভাবে সব যেন কেমন অস্পষ্ট ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে। বেপরোয়া আঞ্চলিক শব্দের ঝনঝনা, আড়ষ্ট ভাষা, গুরুচণ্ডালী দোষ, ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস ও ভাষা প্রয়োগের মায়াবী কৌশলের অভাবে পাঠককে হোঁচট খেতে হয়েছে, মাঝে-মধ্যেই। আসলে কড়া ধাতযুক্ত নীতিপথের মানুষ ছিলেন বলে কখনো ফেনিয়ে বলা পছন্দ করতেন না। উপরন্তু হৃদয়টি ছিল বড়ই কোমল। মানুষই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই মানুষের শোকে-দুঃখে, আপদে-বিপদে অতিরিক্ত মাত্রায় সংবেদনশীল ছিলেন বলে লেখার মধ্যেও ফুটে উঠত ভাবাবেগের প্রাবল্য।

তবে লেখার পারম্পর্য লক্ষ করলে চোখে পড়ে, তিনি নিজেকে তৈরি করছেন সাধ্যমতো। কারণ ভুললে চলবে না, মানুষটি চির-উদ্যমী। তাঁর লেখা অনুসরণ করলে বোঝা যায় বেদ-বাইবেল, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। বঙ্কিম-রবিঠাকুর-শরৎচন্দ্র প্রমুখের বাংলা ক্লাসিকগুলি পড়ে নিয়েছেন, যতটা সম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকগুলি ঘোরাফেরা করত তাঁর কণ্ঠে। ক্রমে লেখার সংস্কার ও শুদ্ধির ব্যাপারে পরামর্শ নিতে থাকলেন শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আভিধানিক ভোলানাথ ঘোষ, বিমল ঘোষ (মৌমাছি), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র বাগল প্রমুখ যশস্বীদের কাছ থেকে। নিজেকে করে তুলছেন সাধ্যমতো উপযুক্ত।

তাঁর সবচাইতে জনপ্রিয় বই 'আজকের আমেরিকা'। এটির চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় সোজাসাপটা ভাষায় বলেছেন— "আমি সত্যের সন্ধানে দেশ ঘুরেছি। ভাষা বা সাহিত্যের টেকনিক নিয়ে রঙমশাল তৈরী করার অবকাশ পাইনি— ইচ্ছাও তেমন ছিল না। তাই আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি যথেষ্টই থাকার কথা। তবে এটুকু সান্ত্বনা আমার যে, সত্যকথা বলতে আমি ভীত হইনি। আমার দেশবাসী অন্ততঃ একজনেরও যদি 'আজকের আমেরিকা' পড়ে দৃষ্টি প্রসারিত হয়, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।"

লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, নিজেকে যেমন অকাট্য আত্মসমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন, আবার টপকে গিয়ে লেখক-সম্ভাবনাকেও প্রতিষ্ঠা করেছেন, নিজের অজ্ঞাতসারে। কেননা, কলমের টানে এমন করে সাজিয়েগুছিয়ে বলতে পারাটাই তো

সেই সম্ভাবনার দুয়ার খোলা।

এ-কথা আক্ষরিকভাবে সত্যি, আপন নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও সাধনার জোরে রামনাথ তাঁর লেখা ও ভাষার উন্নতি করছিলেন একটু একটু করে। শেষের দিকের রচনাগুলি জট ও দুর্বোধ্যতা মুক্ত হয়ে অনেক বেশি সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল হতে থাকে। কিন্তু একটাই অভাব। তা হল কল্পনাশক্তির কারিগরি বা রচনার কলাকৌশল ও গঠনশৈলীর দিক। সব মিলিয়ে তিনটি উপন্যাস, দুটি গল্পের বই ও তিরিশটির বেশি ভ্রমণ কাহিনি পড়ে আমার মনে হয়েছে, বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা এবং তাঁর কিছু কিছু ধারণা কাটছাঁট করে, সম্পর্কযুক্ত কিছু কল্পনামূলক অংশ জুড়ে সমগ্র রচনাকে টানটান করে বাঁধতে পারলেই হয়ে উঠত সোনায় সোহাগা। কারণ তথ্যসূত্রে এবং বিষয়ের সম্পদে বইগুলি ছিল অমূল্য। কিন্তু রামনাথের ক্ষেত্রে মুশকিল হচ্ছে, যা নিজে বোঝেননি বা দেখেননি তা বানিয়ে বানিয়ে কালির আঁচড়ে এক বর্ণও বেরোয় না। এখানেও সেই একগুঁয়ে রামা। অথচ যা একজন লেখকের বড়ই কাম্য ও সারা জীবনের সাধনা, সেই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল সীমাহীন। বাড়তি সংযোজন— নিজস্ব প্রজ্ঞার রশ্মি। পেটুক ঠাকুরের উদরটি ভরা থাকলে তাঁর চিন্তাশক্তি বা স্বচ্ছ দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু ওই পর্যন্ত। অভিজ্ঞতার মাটি ও দূরদৃষ্টির বীজে কলাশৈলীগত জলবায়ুর মেলবন্ধন ঘটাতে সক্ষম হলে আপনিই মেলে ধরে হৃদয় জুড়ানো সাহিত্যের গাছ। তার অভাবে রামনাথ উন্নত মানের জাতে-ওঠা সাহিত্য রচনা করতে পারেননি, ঠিক কথা। কিন্তু যা করেছেন তা একেবারে 'ব্রাত্য' বা ফেলনা মোটেই নয়— পাতে দেওয়া যেতে পারে অনায়াসে। না হলে, ওইসব বই সংস্করণের পর সংস্করণ উড়ে গিয়ে, দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে তরুণ সমাজকে টগবগে উৎসাহে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারত না। সম্ভব হত না এত ব্যাপকভাবে তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করা। তার চাইতে বড় কথা, মনে রাখতে হবে, যাবতীয় কল্পনার অতীত প্রচণ্ড রকমের অমানুষিক কষ্ট স্বীকারের পরও নিজ প্রচেষ্টায় তুলে নিয়েছেন সরস্বতীর কলম। যা সাহিত্যধর্মের বিরোধী। এ কী ধরনের সব্যসাচী! পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি— সরস্বতীর বাঁহাতি আশীর্বাদ পেয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই ডান হাতের ছোঁয়া গ্রহণ করবেন না। বাঁ হাতে ধরা বীণাটিতে ডান হাতের শিল্পীসুলভ আঙুলের ছোঁয়া পেলে তবেই-না শিল্পের মূর্ছনা। ❑

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা

আধুনিক অসমিয়া কবিতার বিবর্তন

হরেকৃষ্ণ ডেকা

ভাষান্তর : **তুষারকান্তি সাহা**

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, এই আলোচনায় অসমিয়া কবিতার বিবর্তনের বিষয়টি আধুনিক যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে। এর কারণ, পৌরাণিক সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত অসমিয়া কবিতার বিবর্তনের যে-ধারা বয়ে এসেছে তাতে বিবর্তনের চাইতে বিভাজনের দিকটি (ইংরেজিতে যাকে break বলা হয়ে থাকে) স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন সাহিত্যের মূল চালিকাশক্তি ছিল ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা। লৌকিক সাহিত্যচর্চা কেউ কেউ করলেও তার ধারা ছিল ক্ষীণ। এমন-কি পীতাম্বরের মতো কবিকে 'গর্ব পর্বতে' আরোহণের জন্য শংকরদেব 'ধর্ম রক্ষার যোগ্য নয়' বলেও নিন্দা করেছিলেন। ষোড়শ শতকে শংকরদেব, মাধবদেব ও তাঁদের সতীর্থ তথা কয়েকজন শিষ্যের কাব্যচর্চায় অসমিয়া সাহিত্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে এবং শংকরদেব-মাধবদেবের ভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট সাহিত্যে অতি উচ্চ পর্যায়ের সাহিত্য-প্রতিভার স্বাক্ষর ফুটে ওঠে। কিন্তু আধুনিক যুগের অসমিয়া সাহিত্যে কাব্যরীতি, কাব্যভাষা ও কাব্যরসে এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন এতটাই দৃশ্যমান যে, যুগের পরিবর্তন এক গতিশীল সাহিত্যে বিবর্তন আনার চেয়ে একটা বিভাজন সৃষ্টি করে এক ধরনের নতুন সাহিত্যের জন্ম দেয়। এ এক যুগ-চেতনারই পরিবর্তন, সাল-তারিখ ধরে ভাবজগতে কোনো একটা যুগের পরিবর্তন নয়। মানবসমাজ এক শতাব্দী থেকে আরেক শতাব্দীতে পদার্পণ করার মধ্যেও তার পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল বলেও মনে করা যায় না। ভারত তথা অসমের ক্ষেত্রে যুগ-পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনাধিকার ব্রিটিশের কবলে আসার পর। এই পরিবর্তনের যদি একটি বিশেষ সাল-তারিখের সন্ধান করা হয় তাহলে ভারতের ক্ষেত্রে ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গের শাসনভার দখল করার সময়সীমার মধ্যে একটি প্রধান রেখা পাওয়া যাবে এবং অসমের ক্ষেত্রে ১৮২৬ সালের মান (বার্মিজ) ও ব্রিটিশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ইয়ান্ডাবু সন্ধিতে রেখা টানতে হবে।

ব্রিটিশ শাসন যে কেবল প্রশাসনীয় পদ্ধতির পরিবর্তন এনেছিল এমন নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি ও চিন্তাধারার স্রোতও বয়ে নিয়ে এসেছিল। ব্রিটিশ-আধিপত্যকে ভারতীয় শাসকরা নির্বিবাদে মেনে নেননি। তবে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামও সংঘটিত হয়নি এবং ব্রিটিশের সঙ্গে বা পরম্পরার সঙ্গে লড়াই করে শক্তিহীন হয়ে-পড়া দেশীয় শাসকদের সামর্থ্যও হারিয়ে গিয়েছিল। কৌশলী (কূট) ব্রিটিশ এক সুস্থির শাসনপদ্ধতির প্রবর্তন করে ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রচেষ্টাকে রক্ষণশীলতা থেকে মুক্তির আদর্শ হিসেবে এক প্রজাহিতকর শান্তির শাসন রূপে যেন দেখানোর চেষ্টা করেছিল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে প্রশাসনে সহযোগ করতে ব্রিটিশ-অনুগত একটি শ্রেণির জন্ম দিয়েছিল। এর ফলে একশ্রেণির শিক্ষিত মসিজীবী মধ্যবিত্ত লোক সমাজ-জীবনে প্রথম সারিতে এগিয়ে আসতে থাকে। পশ্চিমের জ্ঞানের দুয়ারের সন্ধান পেয়ে উন্নতিকামী এই শ্রেণির

লোকেরা ইংরেজ-শাসকদের প্রতি আনুগত্য দেখাতে থাকে। ভারতীয় নব্যশিক্ষিত শ্রেণির মনে এই পরিবর্তনের ঢেউ অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠীর প্রদর্শিত পরিকল্পিত পথে পশ্চিমি-উদারতান্ত্রিক সমাজচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই নতুন ভারতীয় মধ্যবিত্তরা পৌরাণিক জীবনবোধ থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিমি আধুনিকতাকে গ্রহণ করার জন্য উৎসুক হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি পৌরাণিক জীবন-প্রথাকে রক্ষণশীল বলে মনে করতে শুরু করে এবং পশ্চিমি সাংস্কৃতিক পরম্পরাগত জীবন-প্রথার সঙ্গে সংঘাতে না-গিয়ে নিজেদের তার সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা চালায়।

এটা ঠিক যে, বাংলার নবজাগরণের পালে পাশ্চাত্য জ্ঞানের হাওয়া উৎকৃষ্ট সৃজনশীলতার প্রেরণা জুগিয়েছিল। বাঙালির মনে জাতীয় চেতনা সুপ্ত থাকেনি, বরং জাতীয় পরম্পরার মধ্য দিয়ে নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যেই প্রবহমান ছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্বমনীষার প্রতি নতুন আগ্রহ বা প্রবণতা তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে এক সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধিত হয়ে আধুনিকতার সৃষ্টি করে।

অসমে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্য-ভাবধারার আগমন ঘটেছিল এমন কথা বলা যায় না। এর আগমন ঘটেছিল ক্রমান্বয়ে, কলকাতায় অধ্যয়নরত অসমের ছাত্রদের মাধ্যমে এবং কিছুসংখ্যক উচ্চবর্গের অসমিয়া সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ কর্মকর্তা, কর্মচারী, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সংস্পর্শের মাধ্যমে। অসমে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পর ব্রিটিশরা সরকারি কাজকর্ম ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষাকেই অসমে প্রবর্তন করে। অসমিয়া ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি লাভের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে বৌদ্ধিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয় এবং ১৮৭৩ সালে সেই স্বীকৃতি মেলে। প্রকৃতপক্ষে ভাষা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অসমিয়া মানুষের মনে ভাষিক জাতীয় চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এর ফলে বাংলা ভাষার প্রতি এক ধরনের ঈর্ষা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হলেও তা বাংলা সাহিত্যের প্রতি কোনো ধরনের বিরূপতার সৃষ্টি করেনি। কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশ বাংলা সাহিত্যের নতুনত্বের যে-পরিচয় সেই সময়ে সেখানে অধ্যয়নরত অসমিয়া ছাত্রদের দিয়েছিল সেই উজ্জীবিত পরিবেশ তাদের জন্য যেন এক আলোকপ্রাপ্তির বার্তাও বয়ে নিয়ে আসে। ফলে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতা তাদের জন্যও আধুনিকতার এক নিদর্শন-সদৃশ হয়ে ওঠে। তৎকালীন শিক্ষিত অসমিয়া যুব-প্রজন্মও বাঙালি শিক্ষিতদের ধ্যানধারণা অনুসরণ করে প্রাচীন ভাবাদর্শে আবদ্ধ অসমিয়া জীবনচর্যার মধ্যে নানাবিধ রক্ষণশীলতা ছাড়াও উদ্যমহীনতা বা এক ধরনের জড়তা লক্ষ করেছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অসমের সজীব লোকসংস্কৃতি-সহ জাতীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ যুবসমাজ এর বিরোধিতার প্রয়োজন অনুভব করেনি। আধুনিকতাকে গ্রহণ করার পরও এরা প্রবহমান লোকসংস্কৃতির সজীবতার দিকটিতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। যদিও একধরনের কোটপ্যান্ট-পরা সাহেবিয়ানা ও উন্নাসিকতার মনোভাবসম্পন্ন একদল নব্যশিক্ষিতের মধ্যে কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল। তবুও বৌদ্ধিক ঔৎসুক্যেভরা চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পাশ্চাত্য উদারতান্ত্রিক প্রবাহ থেকে আগত চিন্তাচর্চার ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে।

ব্রিটিশ প্রশাসকদের একাংশের ভুলের জন্য বাংলাভাষা অসমে প্রবর্তিত হওয়ায় অসমিয়াদের মধ্যে যে-সংকটভাবনার জন্ম হয় তার প্রতিক্রিয়ায় ভাষিক জাতীয়তাবোধও ওইসব মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। ফলে অসমিয়া ভাষার উন্নতি উক্তপন্থীদের অভীষ্ট লক্ষ্য হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, পশ্চিমি শিক্ষার আলোয় এই অভীষ্টের সিদ্ধির সন্ধান করা হয়েছিল। যেহেতু ভাষার সংকটের চিন্তা বাংলাভাষার প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে উদিত হয়েছিল সেহেতু আপন ভাষার প্রকাশক্ষমতা ও তার সাহিত্যকে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সমকক্ষ হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব অনুভব করে তারা। কিন্তু অগ্রগতির এই অন্বেষণে নব্য বাংলা সংস্কৃতি ছাড়া অসমিয়াদের সামনে তখন অন্য কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না। অসমিয়া ভাষা-সাহিত্যের আধুনিকতার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বঙ্গীয় নিদর্শনের এই মিশ্রণ কোনো অপকার করেনি, বরং আধুনিকতায় প্রবেশ করার ভাষিক পথটি এই মিশ্রণ অনেকখানি মসৃণ করে তুলেছিল। অপরদিকে, বাংলাভাষার সঙ্গে বিরোধ থেকে উদ্ভূত ভাষিক জাতীয়তাবোধ অসমিয়া ভাবধারাকে আপন সংস্কৃতির সজীব হাওয়ার প্রতি সজাগ হতেও সতর্ক করে দেয়। ফলে পোশাকআশাক ও চালচলনে কিছু পরিমাণ সাহেবিয়ানা এলেও অসমিয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত অংশটি ভুয়ো আধুনিকতার দাসত্বে আবদ্ধ না-থেকে নিজেদের প্রবহমান সাংস্কৃতিক পরম্পরার সঙ্গেও সংযোগ রক্ষা করে চলেছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জীবনস্মৃতি বা পদ্মনাথ

গোহাঞি বরুয়ার রচনায় এমনতরো অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। অবশ্য জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রে বেজবরুয়ার মধ্যে জাতীয় গৌরব বেশি প্রবল ছিল। কারণ গোহাঞি বরুয়ার মতো সেখানে রাজ-আনুগত্যের প্রভাব পড়েনি।

অসমিয়া ভাষা-সাহিত্যের নতুন চর্চার নেপথ্যে এ-ধরনের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছিল এবং তার ভিতর দিয়েই এটি আধুনিক যুগে পদার্পণ করে। ভাষা-সাহিত্যের এই আধুনিক যুগটি 'অরুনোদই'-এর পাতায় শুরু হয়েছিল (এ-ক্ষেত্রে ছাপাখানার প্রচলন বিশেষ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে), কিন্তু এই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে সাহিত্যোপযোগী ও প্রকাশক্ষম এক মান্য আধুনিক ভাষা কথ্যভাষা থেকে বেশি সুন্দর হয়ে উঠতে পারেনি। তার পরীক্ষামূলক অক্ষরবিন্যাসও সকলের গ্রহণযোগ্য হয়নি। রস প্রকাশের চেয়ে নতুন চিন্তা ও উপদেশাবলি প্রকাশই পত্রপত্রিকাগুলোর রচনার উদ্দেশ্য ছিল। হেমচন্দ্র বরুয়ার 'আসাম নিউজ'-এ আধুনিক অসমিয়া ভাষার বাঁধন দৃঢ় হতে শুরু করে এবং তদ্ভব, তৎসম ও শুদ্ধ স্থানীয় (থলুয়া) শব্দসম্ভারের একটি সমন্বয় ঘটতে থাকে। 'আসাম বন্ধু' সাময়িকপত্রের দু-একটি কবিতায়ও আধুনিক ভাষারীতি আয়ত্তে আসার লক্ষণ দেখা যায়। তবে তার গঠন ছিল দুর্বল এবং ধ্বনির বিন্যাসও ছিল তখন নড়বড়ে। প্রাচীন পদ্যছন্দগুলির কৌশলী মিশ্রণে আধুনিক ছন্দ সৃষ্টির প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় ওই পত্রিকার কিছু কবিতায়। কবিতাগুলোতে কবিদৃষ্টি আধুনিক ভাবজগৎ থেকে এসে 'সেকুলার' ভাবজগতের আনন্দ-বিষাদের অনুভূতি নিয়ে ব্যক্তিহৃদয়ে প্রবেশ করতে থাকে। তার জন্য দৃঢ়বদ্ধ পদ্যছন্দের বাঁধন শিথিল করার প্রয়োজন হয় এবং সে-প্রয়াসও ফুটে ওঠে 'আসাম বন্ধু'-র কিছু কিছু কবিতায়। এর কয়েকটি কবিতায় দেখা যায়, কবির মুগ্ধ দৃষ্টিতে রোমান্টিক কল্পনার স্পর্শ লেগেছিল। উদাহরণ স্বরূপ সত্যনাথ বরার 'ফুলনি' কবিতার শেষের দিকের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

'রজনীগন্ধার আনন্দ অপার
মুখত নধরে হাঁহি
রূপ বরণীয়া জোনাকো জিনিয়া
ফুলি আছে তিনি পাহি।
বতাহত হালি ক'রে কোলাকোলি
ইডালে সিডালে ধরি।
চুমা আলিংগন দিয়ে আগণন
সাপটা সাপটি করি।'

(রজনীগন্ধার আনন্দ অপার
মুখে যে ধরে না হাসি
মোহিনী জ্যোৎস্নার পরশ নিয়ে
ফুটে আছে তিন পাপড়ি।
বাতাস হেলিয়া করে কোলাকুলি
এ-শাখা সে-শাখা ধরে
চুমা-আলিঙ্গন দেয় অগণন
সাপটাসাপটি করে।)

এখানে অনুপ্রাসের স্পন্দনময় ব্যবহার দেখা যায়। অবশ্য এই প্রয়োগ নতুন বলা যায় না। এ-রকম অনুপ্রাসের ব্যবহার পুরনো কবিতায়ও সার্থকভাবে হয়েছিল। শংকরদেবের 'হরমোহন'-এ একটি অনুপম দিব্য উপবন আছে এবং অসমে জাত বিভিন্ন ফুলের গাছের সমাহার অনুপ্রাসে পদবন্ধ হয়ে এটি অতি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সত্যনাথ বরার 'ফুলনি' কবিতার বর্ণনা 'হরমোহন'-এর দিব্য উপবনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'হরমোহন'-এর দিব্য উপবনে জড় প্রকৃতির এক অপরূপ রূপ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সত্যনাথ বরার কবিতায় 'ফুলনি' মানবীয় অনুভূতিতে স্পন্দিত। 'কোলাকোলি করা' ও 'চুমা আলিংগন দিয়া' প্রভৃতি জড় প্রকৃতি হয়ে থাকেনি। সেখানে কবি-কল্পনা প্রাণের সঞ্চার করেছে। কিন্তু এতে এক নতুন প্রকাশভঙ্গির সন্ধান পেলেও এই কবিতা ভাবের এক বর্ণনাতীত চিত্রের স্তরে পৌঁছতে পারেনি। এখানে কবিকল্পনা কোলরিজের বক্তব্য মাফিক secondary imagination-এর সৃজনীময় রূপান্তর করার ক্ষমতা অর্জন করতে সমর্থ হয়নি।

রোমান্টিক কবিতার সূচনা

১৮৮৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'জোনাকী' আলোচনী বা সাময়িকপত্রে মুদ্রিত কয়েকটি কবিতা এক নতুন কাব্যভাষার জন্ম দিল। অসমিয়া কবিতার আধুনিক যুগের সূচনা উক্ত পত্রিকার সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই ঘটে। কলকাতায় অধ্যয়নরত জাতীয় ভাবনায় উদ্‌বুদ্ধ কয়েকজন ছাত্রের উদ্যোগের ফসল ছিল এই পত্রিকা। তবে এটির দিক-নির্ণায়কের ভূমিকায় ছিলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা ও হেমচন্দ্র

গোস্বামী। নিজের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে 'জোনাকী' শুরুতেই প্রত্যক্ষ ভাষা পরিত্যাগ করে উৎপ্রেক্ষার (মেটাফোর) আশ্রয় নিয়েছিল এ-রকম বক্তব্যে — আমরা সংগ্রামে নেমেছি 'অন্ধকার'-এর বিপক্ষে : উদ্দেশ্য— দেশের উন্নতি 'জোনাক'। জোনাকীর আত্মকথা এভাবে 'অন্ধকার' ও 'জোনাক' (আলো) শব্দ দুটি ঊর্ধ্বকমার মধ্যে প্রয়োগে বাচ্যার্থের ঊর্ধ্বে উঠে অর্থগত ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। 'জোনাকী' নিজের উদ্দেশ্য 'দেশের উন্নতি' বলে উল্লেখ করায় কথাটির মধ্যে ভাষার উন্নতির উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান। স্মর্তব্য যে, জোনাকী 'রাজনীতি'কে তার 'রাজ্য'-এর বাইরে রাখার কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিল। পত্রিকায় সাহিত্যের নান্দনিক যাত্রা নতুন করে সৃষ্ট অসমিয়া মধ্যবিত্তের জাতীয় মর্যাদা রক্ষার যাত্রার সমান্তরাল হয়ে পড়ে। পশ্চিমি উদারতান্ত্রিক মানবতাবাদের হাওয়ার শিহরনে রাজনৈতিক পরাধীনতার কথাটি গৌণ হয়ে পড়েছিল। কারণ তাদের মানসভূমি অন্য এক স্বাধীনতার অনুভূতি লাভ করেছিল— এ এক বদ্ধ জীবনচর্চা থেকে বেরিয়ে এসে জ্ঞানের এক নতুন দিগন্তে মনের উন্মুক্ত বিচরণ-চেতনা। নব-বৈষ্ণববাদের ভক্তির স্রোতে অসমিয়া সম্প্রদায়ের মনোলোকে জীব ও আত্মার মধ্যে সম্পর্ক সন্ধানের মাধ্যমে ইতিমধ্যে এক উদারতাবোধ ও সমতাবোধের বীজ গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল ঈশ্বরসন্ধানী দর্শনের মধ্য দিয়ে আগত আধ্যাত্মিক স্তর। সেখানে 'মুক্তিতে নিস্পৃহ' ভক্তের উপাস্য দেবতার মাধ্যমে নির্গুণ ব্রহ্মকে নারায়ণ রূপে আত্মার ভিতরে উপলব্ধির প্রয়াস ছিল। কিন্তু তাতে ব্যক্তিমনের আবিষ্কার ছিল না। ঈশ্বরকেন্দ্রিক দর্শনে এর প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু পশ্চিমি প্রজ্ঞার বাতাবরণে মানবতাবাদের দর্শনের সঙ্গে এইসব ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে নিবদ্ধ মনের সাক্ষাৎ ঘটে। তার উদারতান্ত্রিকতা ছিল মানবকেন্দ্রিক উদারতা— মানুষের সৌন্দর্য, সামর্থ্য, শৌর্য-বীর্য রেনেসাঁস থেকেই পশ্চিমি জ্ঞান ও দর্শনের কেন্দ্রীয় অন্বেষণের বিষয়। অবশ্য তার সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতিতে রোমান্টিক কল্পনা গুরুত্ব পাওয়ার আগেই মানুষের বহির্জীবন, সমাজ ও বহিঃপ্রকৃতির ক্রিয়াকাণ্ডের দিকটিই প্রধানত প্রতিভাত হয়েছিল। রোমান্টিকতার ধারণার মধ্য দিয়েই এই পশ্চিমি ভাবনায় প্রভাবিত মন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। প্রকৃতিপ্রদত্ত বিশ্বজগৎ যে কল্পনার আলোয় নতুন করে আবিষ্কার করা যায় কিংবা বৈষয়িক অন্বেষণের ফলে হওয়া ক্রিয়াকাণ্ডে যে জাগতিক বিপর্যয় ঘটে তা রোধ করে কল্পনাশক্তির দ্বারা জগৎকে রূপান্তর করা যায় এবং এমন-কি বৈপ্লবিক পরিবর্তনও আনা সম্ভব— এ-রকম ধারণা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল। রোমান্টিকতার এই যুগটিতে কল্পনাপ্রতিভার সৃষ্টিশীলতা শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনোযাত্রার প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে।

'জোনাকী'-র কবিদের মনে পশ্চিমি রেনেসাঁসের মানবতাবাদ ও রোমান্টিক কল্পনা বাহিত মনোমুক্তি— এই দুয়েরই প্রভাব পড়েছিল। এর আগে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র-পত্রিকাগুলি অসমিয়া ভাষাকে এক আধুনিক রূপ দিয়ে সুস্থির অবস্থায় এনেছিল। উপযুক্ত একটি ভাষার মাধ্যমে কল্পনাশক্তির ধারণা নতুন পথ খুঁজে পাওয়ায় রোমান্টিক অসমিয়া কবিতার ধারা 'জোনাকী'-তে শুরু হয়ে গেল।

'জোনাকী'-র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার 'বনকুঅরী' কবিতাটি কাব্যজগতে যে-নতুন স্পন্দন সৃষ্টি করল তার প্রতি সাড়া দিয়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর জীবনস্মৃতিতে কবিতাটিকে 'অসমিয়া ভাষায় বর্তমান কালের উপযোগী সুমধুর কবিতা' (শুঅলা কবিতা) বলে মত প্রকাশ করেন। তদুপরি বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি poem শব্দটি ব্যবহার করে এই অসমিয়া কবিতাটি যে ইংরেজি poem ধরনের সেটিও সকলকে জানানোর চেষ্টা করলেন। এই মন্তব্যে 'বর্তমানের কবিতা' যে 'পৌরাণিক পদ্য' থেকে পৃথক তা দেখানোর প্রয়াস ছিল। বেজবরুয়ার জীবনস্মৃতিতে জনাকয় রোমান্টিক ইংরেজ কবির নাম প্রসঙ্গক্রমে এসেছে এবং এ-কথাও উল্লেখ আছে যে, রোমান্টিক কবিতার গীতিময়তা প্রকাশের স্বাদ সেই সময়ে কলকাতায় পাঠরত অসমিয়া ছাত্ররা পেয়েছিল পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত 'গোল্ডেন ট্রেজারি'-র কবিতাগুলো থেকে। অসমিয়া রোমান্টিক কবিতায় তাই Golden Treasury-র প্রভাব ব্যাপক। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে আধুনিকতাবাদী পর্ব শুরু হওয়ার পরেও পলগ্রেভ-এর 'গোল্ডেন ট্রেজারি' ইংরেজি পাঠক্রমের অঙ্গ হিসাবে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণিতে পড়ানো হত। সম্ভবত অসমিয়া আধুনিকতাবাদী কবিদের, টি. এস. এলিয়টের প্রভাব সত্ত্বেও,

রোমান্টিক মেজাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না-হওয়ার এটাও একটা কারণ।

অসমিয়া কবিতা ষোড়শ শতকের নব-বৈষ্ণববাদের ভিত্তিতে ভক্তিকেন্দ্রিকতার মাধ্যমে যে-রূপ নিয়েছিল তার পদলালিত্য এসেছিল কয়েকটি বিশেষ ছন্দোবন্ধের মধ্য দিয়ে, কিন্তু তার ভাববস্তু সমসাময়িক লৌকিক সংস্কৃতির জগৎ থেকে নয়। তা এসেছিল ভক্তিকে প্রগাঢ় করে তুলতে সক্ষম কয়েকটি পুরাণ থেকে— যার মধ্যে ভাগবত-এর অবদানই ছিল সর্বাধিক এবং তার পরের স্থানে ছিল রামায়ণ। ওইসব কাব্যসাহিত্যে সমসাময়িক জনগণের আধ্যাত্মিক জীবন সুস্থির করার প্রয়োজন এবং একেশ্বর সাধনই ছিল প্রধান। মনটিকে আধ্যাত্মিকভাবে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করার সময় ব্যক্তিমনের স্বতন্ত্রতা প্রকাশের সম্ভাবনা সেখানে ছিল না। আধুনিক যুগের অসমিয়া কবিতা রোমান্টিকতার সংস্পর্শে আসার কালেও সমাজজীবনে আধ্যাত্মিক ভাবনার স্রোত বয়ে চলছিল। 'হরি নাম রসে বৈকুণ্ঠ প্রকাশে বহে অমৃতর ধারা' এখনও অসমের নামঘরে-ঘরে মুখরিত হয়ে অসমিয়া সমাজমানসের একটি স্তরে আধ্যাত্মিক ঢেউ তোলে। এতে কোনো ব্যাঘাত না-ঘটিয়েই উনিশ শতকের শেষভাগে রোমান্টিক ভাবাদর্শ অসমিয়া কাব্যজগতে প্রবেশ করে। 'জোনাকী' থেকে 'বিজুলি', 'উষা', 'বাঁহী', 'সুরভি' ও 'আবাহন' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এই ভাবাদর্শের একটি ধারা চল্লিশের দশক পর্যন্ত সজীব হয়ে রইল।

চন্দ্রকুমারের 'বনকুঅরী' কবিতায় রোমান্টিকতার যথেষ্ট লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এর আগে নব-বৈষ্ণব যুগের অসমিয়া কবিতায় যে-প্রকৃতিকে পাই সেই প্রকৃতি মানব মনের অভিঘাতের বহির্ভূত এক জড় প্রকৃতি। কিন্তু 'বনকুঅরী'-তে প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল এক প্রাণময় অস্তিত্ব— যা কবিকল্পনার এক জীবন্ত জগৎ। তার প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে যে-ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়েছে সেগুলি হৃদয়ের অনুভূতি সঞ্জাত। সেখানে 'নিচুক লতিকা' গাছকে 'সাবটে' (জড়িয়ে) ধরে কুলুকুলু স্বরে 'কথা কয়', ঝরঝর করে বোবা বাতাস পাতায় পাতায় কী যেন 'ফুচফুচায়' (ফিসফিসায়), একজোড়া কপোত একে অন্যকে 'মরম যাচে' (আদর করে), চঞ্চল বায়ুতে 'নোম শিয়রে' (রোম খাড়া হয়)। এখানে প্রকৃতি ও অতিপ্রাকৃত (supernatural)-এর সমন্বয় ঘটে। অর্থাৎ কবির রহস্য সন্ধানী কল্পনা বহিঃপ্রকৃতিকে এক প্রাণময় অস্তিত্বে রূপান্তরিত করে। এভাবেই রোমান্টিকতার স্পর্শ লেগে কবির দৃষ্টি জীবনের বৈষয়িক অংশ থেকে অন্তর্ভূমিতে প্রবেশ করে এবং এক অন্তর্বিশ্ব আবিষ্কার করে। এই অন্তর্বিশ্ব থেকে বহির্বিশ্ব পর্যন্ত পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়ে বিষয়কে অতিক্রম করে বাইরের জগতেও এক প্রাণময় জগতের সন্ধান পেতে শুরু করে।

ওঅর্ডস্ওঅর্থ ও কোলরিজ উভয়েই কল্পনাশক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তবে কোলরিজ সৃজনশীল কল্পনা ও সাধারণ কল্পনার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে কবিকল্পনাকে এক সৃজনীশক্তি হিসেবে দেখিয়েছিলেন। এটি কল্পনার দ্বিতীয় স্তর মাত্র। প্রথম স্তরের সাধারণ কল্পনা পর্যন্ত আগত উপলব্ধিকে এই দ্বিতীয় স্তরের কল্পনা তার সৃষ্টিশীলতায় মন্থন করে কবিতার উপাদানে পরিণত করে। ফলে রোমান্টিক ধারণায় কবি হয়ে পড়েন স্রষ্টা, মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী এক প্রতিভাধর। এই তাত্ত্বিক ধারণাগুলি নিশ্চয় এভাবে তখনকার অসমিয়া কবিদের মনে আসেনি। কিন্তু রোমান্টিক চিন্তাচর্চার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট ইংরেজি কবিতার সংস্পর্শে এসে তাঁরাও মনের মধ্যে কল্পনাশক্তির উপস্থিতি উপলব্ধি করেছিলেন এবং তা রূপান্তর করার শক্তির দ্বারা জগতের মধ্যে ব্যক্তিমনের প্রক্ষেপ ঘটিয়েছিলেন। কবি উইলিয়াম ব্লেক বাহ্যিক দৃষ্টির (corporal or vegetative eye) কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনি এর সাহায্যে দেখা ছাড়াও এর ভিতর দিয়ে দেখেন (I look through it and with it)— এ-রকম দু-ধরনের দৃষ্টি অসমিয়া রোমান্টিক কবির কল্পনার মধ্যেও ছিল। রোমান্টিক কবি বৈষয়িক জগৎ থেকে পলায়ন করে স্বপ্নাবেশে নিমগ্ন হয়ে থাকেন বলে অনেকেই ভাবেন— এ-রকম মন্তব্য অতিরঞ্জিত। কল্পনা-প্রতিভার দ্বারা অন্তর ও বাইরের অহরহ আদান-প্রদান ঘটানো এবং কবিতায় তার এক রূপান্তরিত রূপ প্রকাশ করাটা তাঁদের কাম্য। 'বাঁহী' পত্রিকাটির প্রথম বছর চতুর্থ সংখ্যায় কবি যতীন্দ্রনাথ দুআরার লেখা 'কবিতা' নামক রচনাটি অসমিয়া রোমান্টিক কবির কাব্যাদর্শের একটি আভাস দেয়। তিনি তাতে লিখেছেন— "জগৎ-এর ঘটনা মনের মধ্যে যে-ভাবের উদ্রেক করে, অন্যের মনকে মোহাচ্ছন্ন করার শক্তির দ্বারা সেই ভাবের বিকাশই কবিতা; মন ও কল্পনাই কবিতার সৃষ্টিকর্তা; ভাব তার অঙ্গ, মানবসমাজই বিকাশের স্থল।" — এখানে 'মানবসমাজই বিকাশের স্থল' মন্তব্যটি অর্থপূর্ণ। মানবসমাজে যে-উপাদান রয়েছে তা কল্পনার সৃষ্টিশীলতাকে 'বিকশিত' করে তোলে বলে দুআরা বলেছিলেন।

কবিতা কী করে, এই কথার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "হৃদয়কে বিস্ময় রসে ডুবিয়ে নির্জীব মনের ভাব সজীব করে প্রিয় প্রাণে শান্তিজল ছিটিয়ে দেয়।"

রহস্যবোধ ও বিস্ময়রস রোমান্টিক কবির বোধে সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। এ-রকম বোধের মধ্য দিয়েই মানবসমাজ সম্পর্কিত দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল। চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার 'বীণ বরাগী' অসমিয়া রোমান্টিক কবিতার একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। কবিতাটিতে মানবতাবাদের আধারে মানবসমাজের সমস্ত অভিব্যক্তিকে নানা ভাবতরঙ্গের ভিতর দিয়ে এবং বিস্ময়ানুভূতির মাধ্যমে অন্তর্গত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। অলিখিত ভাষার জাগতিক অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য রোমান্টিক কবির প্রিয় ভাষিক অবলম্বন হল প্রতীক। 'বীণ বরাগী'-র বরাগী কবিরই প্রতীক। লেখনী তাঁর 'বীণ' এবং কবিতার ভাবতরঙ্গ তার সুরের স্পন্দন। সাধারণ দৃষ্টিকে অতিক্রমকারী এক দিব্যদৃষ্টির কথা কবিতাটিতে বারে বারে এসেছে এবং তাতে 'অন্তরের চকু'-র উল্লেখ রয়েছে।

১) *দিব্য দৃষ্টিরে চোয়াহে জগতখন*
প্রহেলিকা গুচি এয়ে জীবন-রঞ্জন।

(চতুর্থ তরঙ্গ)

(দিব্যদৃষ্টিতে দ্যাখো জগৎখানি
প্রহেলিকা ঘুচে এটাই জীবন-রঞ্জন)

২) *অন্তরর চকু মেলা মোর বন্ধু*
দিব্য দৃষ্টিরে ফুরা
এই দাপোনত শুধু প্রতিবিম্ব
বাহির ভিতর জোরা

(অষ্টম তরঙ্গ)

(অন্তর্দৃষ্টি মেলে ধরো বন্ধু
দিব্যদৃষ্টিতে করো বিচরণ
শুদ্ধ দর্পণে শুধু প্রতিবিম্ব
ভিতরে-বাইরে নিরীক্ষণ)

উল্লিখিত স্তবকটির শেষে আমরা পাই রোমান্টিক কল্পনার এক নিগূঢ় অনুভূতি। যেখানে কবি একজন স্রষ্টা, যাঁর অসাধারণ দৃষ্টি গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে এবং যা হয়ে উঠতে পারে মানবতার কণ্ঠস্বর —

মোরেই মুখেদি মানব-প্রাণর
ফুটক আকুল মাত,
মোর চিন্তাতেই গূঢ় রহস্যর
সত্য হ'ক প্রতিভাত।

(আমারই মুখে মানব-প্রাণের
ফুটুক আকুল স্বর
আমারই চিন্তায় গূঢ় রহস্যের
সত্য হোক প্রতিভাত)

অসমিয়া রোমান্টিক কবিতার অন্বেষণ কোন্ দিকে নির্দেশিত হয়েছিল সে-কথা চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাব যে রোমান্টিক অসমিয়া কবির কাছে সৌন্দর্য সন্ধানই ছিল প্রধান অবলম্বন। এই সৌন্দর্য সন্ধানের একটি মূল ভাব পরিলক্ষিত হয় চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার অন্য একটি কবিতার পঙ্‌ক্তিতে, 'সৌন্দর্যর আরাধনা জীবনর খেল'। সৌন্দর্য-সন্ধানকে একমাত্র অবলম্বন না-বলে আমরা প্রধান বলে উল্লেখ করেছি এ-কারণেই যে, অসমিয়া রোমান্টিক কবিতায় নানা অভিব্যক্তি ও অন্বেষণ আছে, যেমন— দেশপ্রেম, নারী-পুরুষের ভালোবাসা, অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতার সন্ধান, বিষাদ, নৈরাশ্য, ভয়ংকরের প্রতি আকর্ষণ, প্রকৃতিপ্রেম, মানববন্দনা ইত্যাদি। কিন্তু প্রায় সবক্ষেত্রে কবিদৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সৌন্দর্যস্পৃহা এবং এই স্পৃহার ভিতর দিয়েই উঠে এসেছে নানা ধরনের ভাবতরঙ্গ। এই সৌন্দর্যস্পৃহা এক দার্শনিক আধার হয়ে সমস্ত অভিব্যক্তির অন্তরালে আলোড়িত হয়ে চলেছে।

চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার উল্লিখিত কবিতার 'সুন্দরর আরাধনা জীবনর খেল' (সৌন্দর্যের আরাধনা জীবনের খেলা) কথাটির 'আরাধনা' শব্দটি প্রণিধানযোগ্য। মানুষের আধ্যাত্মিক অন্বেষণে যেখানে ছিল ঈশ্বরের আরাধনা, সেই স্থানে উপাস্য দেবতাকে স্থানান্তরিত করে নিয়ে এল রোমান্টিক সৌন্দর্য (কিট্‌স-এর beauty truth-এর প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়)। বাগ্মীবর নীলমণি ফুকন (বড়) 'সুন্দর তুমি ক'ত' বলে আজীবন সুন্দরকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, কিন্তু এই সৌন্দর্যস্পৃহা তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয় চেতনাকে নির্বাপিত করতে পারেনি। নলিনীবালা দেবী 'অসীম সৌন্দর্য-তৃষ্ণা'-র কথা বলেছিলেন এবং এই সৌন্দর্য-তৃষ্ণা যে রূপতৃষ্ণা (quest for form) এবং সুন্দর যে চিরসুন্দর (অতীন্দ্রিয় transcendent) তার আভাসও দিয়েছেন এভাবে—

'মানুহর দু চকুর অসীম সৌন্দর্য-তৃষ্ণা
সুখ-আশা, হেঁপাহ বুকুর,
নহয় ই মরতর ক্ষন্তেকীয়া জীবনর
সুখ-আশা পরমপদর
রূপতৃষ্ণা চির সুন্দরর।'

(মানুষের দু-চোখের অসীম সৌন্দর্য-তৃষ্ণা
সুখ-আশা, আকাঙ্ক্ষা বুকের,
নয়তো এ মর্তের ক্ষণিক জীবনের
সুখ-আশা পরমপদের
রূপতৃষ্ণা চিরসুন্দরের)

এখানে পরমপদ (আধ্যাত্মিক আরাধ্য ঈশ্বর)-কে স্থানান্তরিত করেছে 'চিরসুন্দর'। সেকুলার অন্বেষণে আধ্যাত্মিক অন্বেষণ মিশ্রিত হয়ে গেছে। সূর্যকুমার ভূঞার 'আপোন সুর'-এ এসেছে অনন্তের ধারণা এবং সেখানেও কিট্স-এর truth□beauty কথাটির প্রতিধ্বনি রয়েছে।

'সত্য যি সুন্দর যার অনন্ত যৌবন
তারেই বুকুত মই পাতিম কানন।'
(সত্য যে সুন্দর যার অনন্ত যৌবন
তারই বুকে আমি গড়ব কানন।)

অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর সৌন্দর্য-অন্বেষণ ভূমা স্পর্শ করেছে। কবিপ্রাণে এক সৌন্দর্য-প্রতিমা নির্মাণ করেছে, এই প্রতিমা তাঁর 'রাণী'। রানির বুকে বেল-বকুলের গন্ধ 'বিচার করি' (সন্ধান করে) আকাশের দিকে চেয়ে অন্ধকারের অতল তলে চলে যেতেও কবি প্রস্তুত— এই আকাঙ্ক্ষা সীমাকে অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা। অম্বিকাগিরির অসীম সৌন্দর্যতৃষ্ণা পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষণ দেখায় না, কেবল এই অন্বেষণেই লাভ করে নান্দনিক পরিতৃপ্তি।

'আদ্যন্তহীন চুমা অভিযান' কবিতায় কবি বলেছেন

'উন্মাদী চুমারে মই আছো আগুয়াই—
রাণীয়ে নিদিয়ে ধরা— আছে পিছুয়াই—
ইদরে অনন্তকাল ওঁঠ দুটি মোর
চুমালৈ রাণীকে খেদিছে— নাই ওর—'
(উন্মাদী চুম্বন নিয়ে আমি গেছি এগিয়ে
রানি তো দেয়নি ধরা— রয়েছে পিছিয়ে
এভাবে অনন্তকাল ঠোঁট দুটি মোর
চুম্বন নিয়ে ধেয়েছে রানিকে— নেই শেষ)

অম্বিকাগিরির কবিতার এই সৌন্দর্যতৃষ্ণা পরবর্তী সময়ে রূপান্তরিত হয়েছে মানবীয় অন্বেষণের বৌদ্ধিক অভিযানে। কবি 'স্তব্ধ, নিবিড়, নিবিড় নিমাত/অজানা উলাহ এটি অতিপাত/অতল হিয়ার উপচাই পার/আকুল বিকুল হৈ' ওঠার পর দেখতে পেয়েছেন বজ্রকঠোর দুঃখবেদনা, 'নির্যাতনর ঘোর ঘরিষণ লগা' জীবনে 'মত্ত, মহৎ, কালবিজয়ী রুদ্র লীলার ভমক ভেদা অনল' এবং তার মধ্য দিয়ে সেই জীবনে তাচ্ছিল্য, অপমান, অবজ্ঞার যন্ত্রণা পেয়েও 'মুক্ত মাণিক জ্বলে'।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, অসমিয়া কবি যে-দৃষ্টিতে অসীম-রূপ অন্বেষণ করেছিলেন, সেই দৃষ্টি অসমিয়া পৌরাণিক কবিতার কবিদৃষ্টি থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার নয়। এই দৃষ্টি এসেছিল পাশ্চাত্য দৃষ্টির সংযোগ থেকে। তবে সেখানে রোমান্টিক উপাদানের সঙ্গে মিলন ঘটেছিল ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তা থেকে উদ্ভূত অতীন্দ্রিয় উপাদানের। অসমিয়া লোকসাহিত্যেও (মৌখিক) গীতিময়তার একটা স্তর বহু যুগ থেকেই বহমান ছিল। এই স্তরের স্পন্দনও রোমান্টিক কাব্যদৃষ্টিতে মিশে গিয়েছিল।

অম্বিকাগিরির রোমান্টিক মনই কেবল জীবনের ক্ষুদ্র জাগতিক অঞ্চল থেকে ভূমাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেনি, অন্যান্য কবিদের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছিল। পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া একদিকে প্রকৃতির কবি, অন্যদিকে লোকসংগীতেও স্পন্দিত তাঁর মন। তাঁর মনের মধ্যে বিহুগীত, বনঘোষার মধুর সুর ঘুরপাক খেত, যেখানে গীতিময় ছন্দ প্রকৃতির উপাদানের স্পর্শে আলোড়িত হয়ে উঠত। কিন্তু পার্বতীপ্রসাদের 'বীণ বরাগী' কবিতার বৈরাগী 'চির অভেদ্য মহা রহস্য'-এর ওপারে 'মহাজীবন'-এর দীপকেও অন্বেষণ করেছিল। এখানেও সীমা অতিক্রম করার প্রচেষ্টা লক্ষ করি আমরা। পার্বতীপ্রসাদের 'বীণ বরাগী' চন্দ্রকুমারের 'বীণ বরাগী'-র দ্বারা প্রভাবিত। অবশ্য চন্দ্রকুমারের বীণ বরাগীর মতো পার্বতীপ্রসাদের বীণার ঝংকার বিবিধ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত বলা যায় না। চন্দ্রকুমার নিজে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'বীণ বরাগী' কবিতা থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার বীণ বরাগী মানুষের মহত্তর মানবতাবাদের মধ্যে তার অন্বেষণ করেনি। এই বৈরাগী বা বাউল জাতীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে অতীত-গৌরবের পুনঃসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেছিল। কিন্তু এই অন্বেষণের শেষ পর্যায়ে বীণ বরাগী 'আকাশী রস'-এর সুধার সন্ধানে এক রোমান্টিক স্বর্গে উপনীত হয়েছিল এবং কল্পনার দ্বারা জগৎটিতে রূপান্তর আনার কথা বলেছিল—

'নতুন প্রাণর ন চকুজুরি
দীপিতি ঢালি দে তাত,
পুরণি পৃথিবী
নকৈ চাই লও
হে বীণ এযারি মাত।'
(নতুন প্রাণের নতুন দৃষ্টিতে
দীপ্তি ঢেলে দে সেথা

পুরনো পৃথিবী
দেখে নিই নব সাজে
হে বীণা, বাজো একটু হেথা।)

এই কবিতার বীণ অসমের জাতীয় গৌরবের স্মৃতি থেকে জীবনের আনন্দ সন্ধান করে পুরনো পৃথিবীকে নতুন করে গড়ার যে-প্রয়াস করেছিল তার মধ্য দিয়ে 'বীণ'টি সৃষ্টিশীল কল্পনার এক প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

অসমিয়া অন্যান্য কবির কল্পনার সৃজনীশক্তিও হৃদয়ের আবেগকে সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করেছিল এবং কবিকে সসীমের সীমা অতিক্রম করে অসীমের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় উৎসাহ জুগিয়েছিল। শেলির 'মেডুসা' কবিতার প্রতিধ্বনি লক্ষ করা যায় রঘুনাথ চৌধারীর একটি কবিতায়। এটি প্রত্যক্ষ প্রতিধ্বনি নয়। চৌধারীর 'ফুলশয্যা' কবিতায় ধ্বংসের ভয়াবহ রূপকে সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে— যেন এই কল্পনায় ভীষণতাও সুন্দরেরই এক বিপ্রতীপ রূপ—

'জ্বলিছে দূরত সৌ প্রলয়র শিখা
ধরিছে কি রূপ বিতোপন।
সেয়ে মোর ফুলশয্যা রক্তকমলর
লম তাত অনন্ত শয়ন।'
(জ্বলছে দূরে ওই প্রলয়ের শিখা
ধরেছে কী রূপ শোভন।
সেই মোর ফুলশয্যা রক্তকমলের
নেব সেথা অনন্ত শয়ন।)

এখানে 'অনন্ত শয়ন' কথাটির দ্বারা মৃত্যুর মধ্যে অমরত্বের ধারণাটি যেন জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

রত্নকান্ত কাকতীর 'সুন্দরর আহ্বান'-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

'আজি নাজানো কোনে মাতিছে মোক
মেঘর লগত যাবলৈ।'
(জানি না আজ কে ডাকে মোরে
মেঘের সঙ্গে যেতে।)

এই অজানা আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে কবিপ্রাণ সীমা থেকে অসীমের উদ্দেশে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন—

'আজি উরিম মাথোন মেঘর লগত
নীলিম গগন বিচারি
পূবে পশ্চিমে যেনিবা পাওঁ
মধুর বাঁহীর সহাঁরি'
(আজ উড়ব কেবল মেঘের সঙ্গে
নীল আকাশের খোঁজে
পুবে-পশ্চিমে যদি-বা পাই
মধুর বাঁশির উত্তর)

'মধুর বাঁহী' (মধুর বাঁশি) কথাটি মনে করিয়ে দেয় রোমান্টিক পর্যায়ের আধুনিকতার কালে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাটি, যার নামও 'বাঁহী'। ওই নামটিই যেন রোমান্টিক কবিতার মধুরতা-সন্ধানী এক প্রতীক।

রোমান্টিক বিষাদ যতীন্দ্রনাথ দুঅরার কবিতায় অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে চলেছে। এই বিষাদ মধুরতার আকর্ষণ থেকে দূরে নয়। সুন্দরের সোনালি দেশের অন্বেষণে এই বিষাদের উৎপত্তি এবং এই সোনালি দেশ হল আদর্শ সৌন্দর্যের নামান্তর। যতীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় কবির প্রতীক হিসেবে কল্পনা করেছেন একজন মাঝিকে (রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'-র মাঝির মতো নয়)। জীবনের যাত্রাপথের গোধূলি লগ্নে আমরা মাঝির দেখা পাই এবং এই যাত্রা সর্বদাই ভাটির দিকে যাত্রা। নতুবা এই যাত্রা দৃশ্যমান প্রকৃতিতে যে-তীর দেখা যায় তার থেকে দূরে রহস্যের আবর্তে অবস্থিত অপর এক তীরের উদ্দেশে যাত্রা, আর সে-কারণেই এ-যাত্রা অন্য এক আকর্ষণ। ইন্দ্রিয়গোচর ও ইন্দ্রিয়াতীতের সংযোগের মাধ্যম তরীটিকে এক অর্থে আমরা কবিকল্পনার প্রতীক হিসেবে ধরে নিতে পারি। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ সমস্ত বিষাদ অতিক্রম করে মাটির পৃথিবীতে তাঁর দৃষ্টি একসময় ফিরিয়ে এনেছিলেন। 'এই ধরণীর প্রতি ধূলিকণে সোণর সরগ রচে, মরণবিজয়ী প্রেমর সুরত অমৃত উঠলি পরে।' এ-রকম সৌন্দর্যবোধ তাঁর কবিতায় বিষাদবোধকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল।

রোমান্টিক কবিতার শেষ যুগে আবির্ভূত হয়ে দেবকান্ত বরুয়া সম্ভবত তাঁর পূর্বসূরিদের কল্পনার অসীম যাত্রাকে, আনন্দের অশরীরী শিহরনকে কিংবা সৌন্দর্য সন্ধানের গগনচুম্বী প্রয়াসকে ভোক্তা পুরুষের দৃষ্টিতে মর্তে রক্তমাংসের শরীরী জগতে নামিয়ে এনেছিলেন। সেখানে বিভিন্ন রূপে নারী এসেছিল কেবল নীরব শ্রোতার ভূমিকায়। কারণ সেই নারীর অস্তিত্ব ঘোষিত হয়েছিল কবিতার এককথনের গাঁথনির ভিতর দিয়ে। কবি সসীমকে রূপান্তর করেননি, বরং অসীমের প্রতিরূপ খুঁজেছেন সসীমের মধ্যে। 'কলঙ পারর এই দুঅরীত আকাশর বিচারো তুলনা।'

(কলংপারের এই দুয়ারে আকাশের তুলনা খুঁজি) কিন্তু তাই বলে কবি অ-রোমান্টিক নন। তাঁরও ছন্দের তুলি 'অশ্রুক্লান্ত জীবন'-এর সোনালি ছবিই আঁকে। দৃশ্যমান জগতের প্রকৃতির কোলে ফুল ও প্রজাপতির চুম্বনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন প্রেমের রূপ। তাঁর কবিতায় দেখা মেলে ট্র্যাজিক চেতনারও। 'দেবদাসী' কবিতায় নিয়তির বিরুদ্ধে মানুষের অক্ষয় সংগ্রামের প্রবক্তা তিনি। তাঁর বিশ্বরূপ দর্শনে নিয়তির জয় নিশ্চিত রূপে দেখা গেলেও মানুষের শৌর্য-বীর্যের কথাও উল্লেখিত। এই শৌর্য-বীর্যের কীর্তিস্তম্ভ কবি, কারণ মানুষের এই অক্ষয় সংগ্রামের চিরন্তন শিল্পিত রূপ তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে উদ্ভাসিত।

এই রোমান্টিক কবিতার যুগের অবসান সূচিত হল বিশ শতকের চল্লিশের দশকে। প্রথমে প্রগতিবাদী কবিতায় শ্রেণিচেতনা সমাজমুখী দৃষ্টি আনার ফলস্বরূপ এবং দ্বিতীয়ত ভাববাদী চিন্তায় বৌদ্ধিকতা আবেগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে না-দেওয়ায় উদ্ভূত কাব্যরীতির ফলে।

॥ দুই ॥

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে অসমিয়া কবিতায় এক নতুন ধারার সূচনা লক্ষ করা যায়। এই সময়ে অসমিয়া কবিতায় রোমান্টিক ভাবধারার গতি দুর্বল হয়ে পড়ে, ভাববস্তুর চর্বিতচর্বণ ছাড়া ভাষাও ভঙ্গিসর্বস্ব হয়ে পড়ে। জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে কবিসত্তার সংযোগ ছিন্ন হতে থাকে। এ-রকম একটি পরিবেশে 'জয়ন্তী' পত্রিকার পাতায় অসমিয়া কবিতার এক নতুন ধারার সূচনা হয়। 'জয়ন্তী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন রঘুনাথ চৌধারী। তিনি অসমিয়া রোমান্টিক কাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তবে ১৯৪৩ সালে তিনি 'জয়ন্তী'-র সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর পত্রিকার দায়িত্বভার নিলেন মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার দুই লেখক— কমল নারায়ণ দেব ও চক্রেশ্বর ভট্টাচার্য। ১৮৮৯ সালটিকে যদি অসমিয়া রোমান্টিক কবিতার সূচনার বছর হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে ১৯৪৩ সালকে প্রগতিশীল বা প্রগতিবাদী কবিতার সূচনার বছর হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। 'জোনাকী'-তে বহুল ব্যবহৃত শব্দটি ছিল 'উন্নতি' (শ্রীবৃদ্ধি) এবং শব্দটির মধ্যে উপ্ত ছিল জাতীয় উন্নতির অনুভব। সেই সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে গড়ে-ওঠা অসমিয়া বিদ্বৎ সমাজ এক রাজনীতি-নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে ভাষা-সাহিত্যের উন্নতিকেই প্রধান কর্তব্য বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে ওই মধ্যবিত্তদের একাংশ ভাষিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস চালান। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ও বিনন্দ চন্দ্র বরুয়ার কবিতায় তার সন্ধান মেলে। অবশ্য অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীও অসমিয়া জাতীয়তাকে ভারতীয় মহাজাতীয়তার অঙ্গ বলে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ অসমিয়া ভাষাগত জাতীয়তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি ভারতীয় মহাজাতীয়তার মধ্যে সেটিকে 'বিশিষ্ট ভাবে' তুলে ধরেছিলেন। তাঁর রচনায় ভারতীয় মহাজাতীয়তাকে বিশ্বমানবতার সঙ্গে সংযোগের প্রচেষ্টাও আমরা লক্ষ করি। রোমান্টিক কবিমানস থেকে যে-ভাবধারা সমাজজীবনে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল সেখানে জাতীয় চেতনার প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। এই জাতীয় চেতনা থেকে সমাজজীবন নিরীক্ষণ করতে গিয়ে অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভাজন তাঁদের চোখে তেমন করে ধরা পড়েনি। তবে প্রসন্নলাল চৌধুরীর কবিতা এর ব্যতিক্রম বলা যায়। তাঁর কবিতায় রোমান্টিক ভাবধারার মধ্যে মানুষের দুটি রাজনৈতিক শ্রেণি নিরূপণের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই শ্রেণির একটি দল "মত্ত দানব দল/করে হানাহানি/আপোনা আপুনি/কাটে মানুহর গল/মত্ত মানব দল" এবং অপর দলটি হল, "জ্যোতি-সূর্য্য পরশত যার/জীবন প্রভাত হ'ল/অনিয়ম-ভয় করিলে বিজয়/নতুন মানুহর দল"। — এ-রকম আদর্শবাদী বিভাজনকে কিন্তু প্রগতিবাদী কবিতা বলে ধরা যায় না। এখানে উৎপাদনের সরঞ্জামের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বিভাজিত দুটি শ্রেণি আমরা প্রত্যক্ষ করি না। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক প্রগতির ধারণার চেয়ে সেখানে রোমান্টিক আদর্শবাদ ও রোমান্টিক বিদ্রোহের ভাবই বেশি প্রকট।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রোমান্টিকতার ভাববাদ থেকে আগত 'উন্নতি' ও বস্তুবাদের দর্শন থেকে উঠে-আসা 'উন্নতি' ও 'প্রগতি' শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য বিশাল। 'জয়ন্তী' পত্রিকার সপ্তম বছরে দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৯৪৫) কমলনারায়ণ দেব 'সত্যকাম' ছদ্মনামে লেখা একটি প্রবন্ধে 'প্রগতি'-র ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে— "প্রতিক্রিয়া পরাগতিকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার নামই প্রগতি, জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্বের অবিরাম লীলা চলছে।... এই দ্বন্দ্বমূলক বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালো করে বুঝতে হলে তার দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার নিতান্ত প্রয়োজন।" স্মর্তব্য যে, 'প্রগতিশীলতা'কে তিনি সাহিত্যের স্থায়ী বিশেষণ বলে উল্লেখ করেছিলেন, কেবল

সমসাময়িক সাহিত্যে 'তার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।' কমলনারায়ণ দেব তাঁর 'প্রগতিশীল সাহিত্যের ভূমিকা' নামক প্রবন্ধে 'উন্নতি'-র ধারণা ও দ্বন্দ্ববাদী প্রগতির মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন। কমলনারায়ণ দেব কিংবা চক্রেশ্বর ভট্টাচার্য জাতীয় চেতনার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেননি (তৎকালীন প্রগতিবাদী ভাবধারার সাহিত্যিক বা চিন্তাবিদদের অধিকাংশই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন), কারণ ঔপনিবেশিকতাবাদকে ধনতান্ত্রিকদের শোষণের অন্যতম হাতিয়ার বলে চিহ্নিত করার জন্য জাতীয় আন্দোলনও দ্বন্দ্বাত্মক প্রগতির একটি স্তর বলে ধরা হয়েছিল।

মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে আধার হিসাবে গ্রহণ করার জন্য প্রগতিবাদী কবিতার সৃজনক্ষেত্র ছিল সমাজ-বাস্তবতা, যেখানে শ্রেণিবৈষম্যের রূপ ধরা পড়েছিল। প্রগতিবাদী কবিকুল রোমান্টিক কল্পিত আদর্শের জগৎটিকে ভাববিলাসী বলে নিরূপণ করেছিলেন। ওইসব কবিতায় রোমান্টিকদের মতো অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সংযোগের প্রয়াস ছিল না। প্রকৃতি (মানবসমাজকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বস্তু বা প্রাণী) থেকে উপাদান হয়তো রূপক বা প্রতীক হিসাবে আনা হয়েছিল (কয়লা, কুকুর), কিন্তু ধনতান্ত্রিক বুর্জোআ সভ্যতার বর্তমান স্তরটির স্বরূপ উন্মোচন করার প্রয়োজনেই তা এসেছিল, প্রতীকবাদীদের মতো বস্তুজগতের ভিতরের আদর্শজগতের সন্ধানে নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সূত্রগুলি এইসব কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে সন্ধান করাও যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ সার্থক প্রগতিবাদী কবিতাগুলোতে মার্ক্সীয় স্লোগান বা তার দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রচার ছিল না, ছিল সেই দর্শনের ভিতর থেকে উত্থিত শ্রেণিচেতনা কিংবা সমাজবাস্তবতার ধারণার মধ্য দিয়ে আগত উপলব্ধির কাব্যিক প্রকাশ।

প্রগতিবাদী কবিতা 'জয়ন্তী'-র পৃষ্ঠপোষকতায় কেবল আকস্মিক আবির্ভাবের ফসল ছিল না, তার একটি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও ছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন অসমের সমাজজীবন আলোড়িত করার সময় তার জাতীয় চেতনা ভাষিক জাতীয়তাবাদ থেকে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল বলে পূর্বেই বলা হয়েছে। এই জাতীয়তাবাদ অসমিয়া সমাজকে একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেরও সন্ধান দিয়েছিল। আন্দোলনের ব্যাপকতা 'জনতা'র বিপ্লবী চরিত্র ও সম্ভাবনাকে প্রকট করে তুলেছিল। মহাত্মা গাঁধী ভারতীয় ভাবধারায় আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতাকে সংযোজন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আন্দোলন-পদ্ধতি ছিল গণমুখী এবং তা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এক জাগ্রত জনতার রূপ ধরে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এই সময়কালে কংগ্রেসি রাজনীতির মধ্যে মার্ক্সীয় চিন্তার স্রোতও বয়ে চলেছিল। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট তার জন্য আরও সুযোগ করে দিয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার কম্যুনিজ্‌ম পশ্চিমের আগ্রাসী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল আর তার প্রভাব ভারতের নবশিক্ষিত একাংশ তরুণের মধ্যেও পড়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান নেতা জওহরলাল নেহরু মার্ক্সবাদ ও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রগতিমূলক কর্মসূচির প্রতি প্রকাশ্য অনুরাগ দেখিয়েছিলেন। কংগ্রেস দলের ভিতরেও কিছু কিছু যুব-সদস্যের মধ্যে বামপন্থী মতাদর্শের প্রভাব পড়েছিল। এমন-কি নেহরু তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে শামিল করার কথাও চিন্তা করেছিলেন (অবশ্য তিনি মূলত ফেবিয়ান সোস্যালিজ্‌মের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন)। অসমে 'প্রগতিশীল' কবিতার ধারাকে গতিশীল করতে প্রয়াসী কমলনারায়ণ ও চক্রেশ্বরও স্বাধীনতা আন্দোলনের রোমান্টিক বিপ্লবের রূপকে অস্বীকার করেননি। বরং 'সাহিত্যর সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে চক্রেশ্বর ভট্টাচার্য রোমান্টিক কবিদের জনগণের পক্ষে সরব হওয়ার প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম দিককার কবিতাকে 'পলায়নবাদী' বলে মন্তব্য করলেও পরবর্তীকালে রচিত কিছু কবিতার তিনি প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিয়েছে। জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ না-ঘটলে তাঁর মতে সেটা 'শৌখিন মজদুরি' বলে গণ্য হয় এবং তার দ্বারা 'ব্যর্থ হয় জ্ঞানের পসরা।" মহাদেবী বর্মার প্রথম জীবনের 'অতীন্দ্রিয়বাদ' বা 'ছায়াবাদ'-এর তিনি নিন্দা করলেও পরবর্তী সময়ে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া এই কবির প্রশংসা করেন এইভাবে : "(যখন) দেশের হাজার হাজার নরনারী মৃত্যুমুখে পড়েছে, পেটের দায়ে যুবতীরা নিজেদের বিক্রি করছে সেই সময় মহাদেবীরও কবিপ্রাণ না-কেঁদে থাকতে পারেনি।"

প্রগতিবাদী কবিতার চেতনার অগ্রভাগে ছিল জনতা, এবং তাদের মুখে ধ্বনিত হয়েছিল বৈষম্যমূলক শোষণের বিরুদ্ধে

তীব্র নিন্দা। তাদের আস্থা ছিল শ্রেণিসংগ্রামের উপর। তাদের আস্থা ছিল যে দ্বান্দ্বিক প্রগতি সাম্য আনবেই। জনতার বিপ্লবী স্বরূপ প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়েছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে, এবং রাশিয়ায় কম্যুনিজ্‌মের অভ্যুত্থান শোষিত শ্রেণির বিজয়ের সম্ভাবনার আশা জাগিয়েছিল। দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটেই এই চেতনা তখনকার যুবকদলের একাংশকে নাড়া দিয়েছিল এবং এরাই রোমান্টিকতার ভাবাদর্শকে পাশ কাটিয়ে এক ধরনের নতুন কবিতার জন্ম দেয়, যাকে 'প্রগতিশীল' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

কমলনারায়ণ দেব ও চক্রেশ্বর ভট্টাচার্যের পরেই এই ক্ষেত্রে অপর এক মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি হলেন ভবানন্দ দত্ত ('নচিকেতা' ছদ্মনামেও তিনি লিখতেন)। ভবানন্দ তাঁর প্রবন্ধ 'অসমিয়া দার্শনিক'-এ ভারতের কংগ্রেসি আন্দোলনের পথ ধরে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে অসমের দেশসেবকদের মধ্যে সমাজবাদী চিন্তাধারা কেমন করে প্রবেশ করেছে তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন : "কংগ্রেসি আন্দোলনের আদর্শভিত্তি ছিল পাশ্চাত্য থেকে আগত মানবমুক্তি, গণতন্ত্র ও ঐক্যের বার্তা এবং ভারতীয় পরম্পরাগত সংস্কৃতির গৌরববোধ। এই আন্দোলন মহাত্মাজির নেতৃত্বে অহিংস সংগ্রামের পথে ধাবিত হল। এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় দশকে অসমের দেশসেবকদের মধ্যে সমাজবাদী ভাবধারার জন্ম হয়, বিশেষত মার্ক্সবাদ ও রুশ বিপ্লবের প্রেরণার মাধ্যমে। পূর্বতন কংগ্রেসিদের প্রেরণা ছিল ফরাসি বিপ্লব। তরুণ প্রজন্মের প্রেরণা হল বিশেষত রুশ বিপ্লব।"

কংগ্রেসের সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনে দেহ-মনে উৎসর্গিত কবি-নাট্যকার-কথাশিল্পী হলেন জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা। 'জয়ন্তী'-র উদ্দীপ্ত প্রগতিবাদী কবিতার জন্মলাভের আগেই জ্যোতিপ্রসাদ বস্তুবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে তাঁর রোমান্টিক বিশ্ববীক্ষায় নিয়ে আসার জন্য তিনি একদিকে রোমান্টিকতার উত্তরসূরি এবং প্রগতিবাদীর পূর্বসূরি হয়ে পড়েছিলেন। জ্যোতিপ্রসাদ ধনতন্ত্রবাদের সুবিধাভোগের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছিলেন এই বলে যে "সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ এই দুটিই পৃথিবীর ইতিহাসে সংস্কৃতির রূপে দুষ্কৃতিরই পূর্ণরূপ।" (শিল্পীর পৃথিবী) কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের মতো তিনি ছিলেন ঐতিহ্যসন্ধানী। "প্রগতির বৃহৎ ভিত্তি হল ঐতিহ্যের সত্য। আজ আমাদের সংস্কৃতির প্রগতি ভারতবর্ষীয় অসমিয়া ঐতিহ্যের সত্যের ওপর অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।" (শিল্পীর পৃথিবী) এই ঐতিহ্য সন্ধানের মধ্যে এক ধরনের শিকড় সন্ধানের অর্থ নিহিত রয়েছে। তাই বলে জ্যোতিপ্রসাদ ঐতিহ্যের নস্টালজিয়ায় মগ্ন থাকেননি। রূপান্তরের মধ্য দিয়ে জগৎ সুন্দর হয়ে ওঠে— এই উপলব্ধি তাঁর বোধের কেন্দ্রে বিরাজ করত। 'সৌ আকাশত নীহারিকা উরে' (ওই আকাশে নীহারিকা ওড়ে) নামক কবিতাটির মূল তাৎপর্য সেটাই — এ-কথা আমরা ধরে নিতে পারি। নীহারিকার আকারহীন জ্যোতিঃপুঞ্জের শক্তিই 'কত জীবন কত রূপর/কত গুণর/বর্ণগন্ধ গানর সুর'-এর রূপ নেওয়ার জন্য বিশ্বভুবন সফরের কথা তিনি বলেছিলেন। সৌন্দর্যের এই রূপান্তরের কল্পনা রোমান্টিকতার ভাবাদর্শ থেকে এসেছে। কিন্তু তাঁর কবিতায় বারে বারে এসেছে 'জনতা' —

"*নবতম মানবর*
জন জীবনর
শিল্পীর য'ত গুণাগঁঠা
দুখীয়াক-সুখীয়াক
নগরীয়া, চহরীয়া, গাওলীয়াক
রনুয়াক, বনুয়াক
হজুয়াক চহুয়াক
মুনিহ তিরোতাক
অভিনব ভাষারে শুনাওঁ।"
(শিল্পীর আলোকযাত্রা)

(নবতম মানবের
জনজীবনের
শিল্পীর যেখানে গৌরবগাথা
দুখী-সুখী
শহর, নগর, গ্রামবাসীকে
যোদ্ধা, কর্মী
শ্রমিক চাষি
পুরুষ-নারী সবাইকে
অভিনব ভাষায় শোনাই।)

জ্যোতিপ্রসাদ জনতার যে-রূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা যেন স্বাধীনতা আন্দোলনে জাগরিত এবং বিপ্লবী সম্ভাবনাময় সর্বস্তরের জনগণের রূপেরই আদল। 'জনতার আহ্বান' কবিতায় তিনি 'প্রবুদ্ধ জনতা'র জয়গান গেয়েছেন এবং আরও গেয়েছেন 'আলোকমন্ত্রপূত মহামানবতন্ত্র'র সুর। এই মানবতার ভিত্তি বৃহৎ হলেও অর্থনৈতিক একটি শ্রেণি হিসাবে জনগণ এখানে

অনুপস্থিত। এখানে মানবতার একটি বিমূর্ত রূপই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তবুও রোমান্টিক কল্পনার সম্পূর্ণ ভাববাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আদর্শলোকের সন্ধান না-করে জ্যোতিপ্রসাদ সমাজবাস্তবতার মধ্যে রূপান্তরের ক্রিয়ার সন্ধান করেছিলেন। এবং সব ধরনের জনতার মধ্যে সাম্য কামনা করেছিলেন।

কমলনারায়ণ দেব ও চক্রেশ্বর ভট্টাচার্যের মতোই ভবানন্দ দত্তও অসমিয়া আধুনিক কবিতাকে ভাববাদী রোমান্টিক কল্পনা থেকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তাত্ত্বিক দর্শনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। অপর দুজনের মতো তিনি কেবল মার্ক্সবাদী সমালোচকই যে ছিলেন তা নয়। ছিলেন একজন প্রকৃতার্থে কবি, যদিও তাঁর রচিত কবিতার সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাঁর যে-সব কবিতাকে প্রগতিবাদীরা 'ভাববিলাসী' ও 'অতীন্দ্রিয়বাদী' বলে মন্তব্য করেছিলেন, রোমান্টিক ধারার সেই কবিতাগুলিতে আবেগ প্রকাশের জন্য ধ্বনিলালিত্যের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রগতিবাদী কবিতা এ-ধরনের প্রচেষ্টা থেকে সচেতনভাবে বেরিয়ে এসেছিল। বাস্তবের রুক্ষতাকে প্রকাশ করতে যেমন শব্দের কোমলতা, নমনীয় ধ্বনিমাধুর্য যথাযথ ছিল না — সে-কারণে ব্যঞ্জনবর্ণের কাঠিন্য বাস্তব জীবনের কাঠিন্যের প্রতিরূপ হয়ে পড়েছিল। এই কবিকুল অসমিয়া কবিতায় একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশশৈলীর মেলবন্ধন ঘটানোর সময় তাঁদের রোমান্টিক ভাবধারার কবিতায় এক অলস অনুকরণপ্রিয়তা লক্ষ করা যায় এবং এঁদের আক্রমণ সামগ্রিকভাবে ভাববাদী কবিতার বিরুদ্ধে হলেও রোমান্টিক কবিতার নিস্তেজ অনুশীলনই তাঁদের বিরুদ্ধে দৃষ্টিভঙ্গিকে বেশি প্রভাবিত করে। তদুপরি অসমের সমাজ-জীবনেও তখন নানা পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। এই সময়ে দালাল, ঠিকাদারদের বেশে সাম্রাজ্যবাদের গোলামি-করা এক সুবিধাবাদী সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হয়। এ-ছাড়া মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব আমজনতার উপর পড়তে শুরু করে। শহরে দিনমজুরের সংখ্যাও বেড়ে যায়। গ্রামে কৃষকরা মহাজনের অর্থনৈতিক কবলে ক্রমাগত শোষিত হচ্ছিল এবং যুদ্ধকালীন অভাব-অনটনের সময় থেকে তাদের উৎপাদন মজুতদারের কবলে বেশি করে যেতে শুরু করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যে-জনজাগরণের জোয়ার দেখা দেয় সেই সময়কালের মধ্যেই এইসব পরিবর্তনের সূচনা হয়। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে তা অধিক প্রকট হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শে বন্দি রোমান্টিকদের চোখে এ-সব ধরা পড়েনি কিংবা সমাজজীবনের এই দিকটির প্রতি তাঁরা উদাসীন ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত একাংশ যুবকের মধ্যে এর প্রভাব পড়ে — তাঁদের একটি অংশ মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন। 'নচিকেতা' ছদ্মনামে ভবানন্দ দত্তের লেখা 'রাজপথ' কবিতাটিতে শ্রেণিশোষণের একটি উদগ্র রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

"*বিচিত্র তোমার লীলা,*
দুকাষে তোমার দালানর সারি
পাঁচতলার ওপরত শুনা যায় রেডিওর গান
অর্গানত রবীন্দ্রসংগীত,
ডবল দলিচা পরা মেহগনি পালেঙত
বিরহকাতর কলেজগার্লর
অলসায়িত দেহা।
আরু তার তলতেই ফুটপাথত
(ধন্য! তোমার দয়া)
শূন্য ভিক্ষার পাত্র লৈ শুই পরা
মৃতপ্রায় কংকালর সারি।"
(বিচিত্র তোমার লীলা,
দু-পাশে তোমার দালানের সারি
পাঁচতলার ওপরে শোনা যায় রেডিয়োর গান
অর্গানে রবীন্দ্রসংগীত,
ডবল গালিচা পাতা মেহগিনি পালঙ্কে
বিরহকাতর কলেজগার্লের
আলুলায়িত দেহ।
আর তারই নীচে ফুটপাথে
(ধন্য! তোমার দয়া)
শূন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে শয্যাশায়ী
মৃতপ্রায় কঙ্কালের সারি।)

কবিতাটিতে দুটি বিপরীত চিত্রকল্পের সম্মিলিত উপস্থাপনায় ফুটে উঠেছে শ্লেষ ও পরিহাস (irony)। কবিতার নাম 'রাজপথ'— এই নামের মধ্যেই রয়েছে পরিহাস। এক বিশাল রাস্তা— যেখানে 'রাজ' (ঔপনিবেশিক রাজ)-এর অনুষঙ্গও যুক্ত রয়েছে। কিন্তু সেই রাজপথ অর্থনৈতিক বৈষম্যের রূপকের মধ্যে অর্থবহুল হয়ে উঠেছে, রোমান্টিক কবিতার বিষাদবোধ এই কবিতায় নেই। পাশাপাশি কুৎসিতকে সৌন্দর্যের প্রলেপ দিয়ে ঢাকার প্রয়াসও সেখানে নেই। শব্দের ব্যবহারেও ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় না। তার পরিবর্তে বাস্তবের রুক্ষতা প্রতিধ্বনিত করতে কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'কলেজগার্ল'-

এর মতো শব্দ রোমান্টিক শব্দসম্ভারে কোনোভাবেই যথোচিত মনে না-হলেও কবি নগর-চিত্রের এক বিশেষ দৃশ্যের প্রয়োজনে শব্দটির ব্যবহারে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

'জয়ন্তী' পত্রিকাটি প্রগতিবাদী কবিতার গতিপথ নির্ণয় করার দায়িত্ব নেওয়ার বহু আগেই বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী কবি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বস্তুবাদী ভাবধারার কবিতা রচনা করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত তাঁর 'অভিযান' সংকলনে বেশ কয়েকটি সার্থক কবিতার সন্ধান মেলে। 'অভিযান'-এর কয়েকটি কবিতা প্রত্যক্ষভাবে প্রচারধর্মী ছিল এবং তার মধ্যে কয়েকটিতে রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ পেয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ 'পৃথিবীর প্রতি' কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। শিরোনামে রোমান্টিক আহ্বানের একটা সুর খুঁজে পাওয়া যায়। সন্দেহ নেই যে কবিতাটিতে শ্রেণিচেতনা স্পষ্ট, কিন্তু সেখানে 'নর' হয়েছে 'নারায়ণ' এবং সাম্যের বেদিতে 'শান্তির আসন' পাতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের পাশাপাশি 'বরুণ দেবতা' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আবার শাক্তধর্মীয় অনুষঙ্গও এসেছে 'চামুণ্ডার রক্ত রঙ্গ খেলা'-য়। অবশ্য এই কবিতাটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার নিদর্শন নয়। ড. হীরেন গোহাঁই তাঁর কবিতায় কাজি নজরুল ইসলামের ভাষারীতি ও প্রকাশের তেজস্বিতার বিষয়ে বলেছেন। সার্থক কবিতাগুলিতে তিনি নজরুলের রোমান্টিক বিপ্লবী ভঙ্গি থেকে সরে এসেছেন উল্লেখ করে ড. গোহাঁই আরও বলেছেন, 'চহা, গএগ ভাষার লগত একাত্ম হৈছে।' এই কবি বলেছিলেন —

"*আমার যি ভাষা হ'ব*
সেই ভাষা কেঁয়ে শুনা নাই
আমার যি গান হ'ব
সেই গান কেঁয়ে গোয়া নাই
আমার যি রোষ হ'ব
তেনে বহ্নি কেঁয়ে দেখা নাই।
এই গান নবজীবনর
এই ভাষা নতুন দিনর
এই জুইয়ে পৃথিবীক পুরি নিব ধুই নিব
পৃথিবী উটাই।"

(আমাদের যে-ভাষা হবে
সেই ভাষা শোনে নাই কেউ
আমাদের যে-গান হবে
সেই গান গায়নি তো কেউ
আমাদের যে-রোষ হবে
তেমন বহ্নি কেউ দেখে নাই
এই গান নবজীবনের
এই ভাষা নতুন দিনের
এ-আগুন পৃথিবীকে পুড়িয়ে নেবে ধুয়ে নেবে
পৃথিবী ভাসিয়ে।)

জ্যোতিপ্রসাদ যখন রোমান্টিক আদর্শের সঙ্গে মার্ক্সীয় চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তখন তিনি বিশ্বজনতার ভিত্তি থেকে বিশ্বশৃঙ্গের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর গতিপথ ছিল মাতৃভূমি থেকে বিশ্বসভার উদ্দেশে এক ক্রমগতির যাত্রা। অন্যদিকে ধীরেন দত্ত শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবর্গের প্রতিনিধির মধ্যে বিপ্লবী চিন্তাচেতনা উদ্দীপিত করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। জ্যোতিপ্রসাদের দৃষ্টিতে শিল্পী ছিলেন 'জনতার শিল্পী', কিন্তু তিনি বিশ্বশিল্পীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ধীরেন দত্তের 'কাঠমিস্ত্রী' শ্রমজীবী অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্বারা নির্ণীত। তিনি যখন নিজের জন্য কাঠে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন তখন তিনি শিল্পী, কিন্তু অন্যের জন্য শ্রম করতে গিয়ে তিনি হয়ে পড়েন অনিবার্যভাবে শ্রমের উপাদান। তিনি শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'শ্রমিক'-এ পরিণত হন।

এই ধারার অন্য এক প্রতিভাধর কবি ছিলেন অমূল্য বরুয়া। কলেজে পড়ার সময় কলকাতায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে তাঁর করুণ মৃত্যু ঘটে। কবি হিসাবে তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ হয়নি। তিনি কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ দুআরা, গণেশ গগৈ, রত্নকান্ত বরকাকতি ও দেবকান্ত বরুয়ার অনুকরণে। কিন্তু মার্ক্সবাদী ভাবধারার প্রভাবে এবং বিশেষ করে 'জয়ন্তী'তে প্রগতিবাদী কবিতার আন্দোলন চলাকালীন তিনি সৌন্দর্যসন্ধানী আদর্শবাদী ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে শ্রেণিচেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে এক মার্ক্সবাদী বিপ্লবী কবিতে পরিণত হন। 'জয়ন্তী'তে প্রকাশিত তাঁর 'বিপ্লবী' শিরোনামে একটি কবিতা লক্ষণীয় —

"*... আমি*
উর্বরা মাটির কর্মনিষ্ঠ পূজারী
যুগ পরিস্থিতির প্রতীক
বস্তু আরু আদর্শর
দ্বন্দ্বাত্মক গতি
সংগ্রামলিপ্ত বিপ্লবী।"

(... আমরা

উর্বর জমির কর্মনিষ্ঠ পূজারি
যুগ-পরিস্থিতির প্রতীক
বস্তু ও আদর্শের
দ্বন্দ্বাত্মক গতি
সংগ্রামে লিপ্ত বিপ্লবী।)

'বিপ্লবী' এখানে এক ব্যক্তিমনের প্রতীক নয়। এটি এক সংগ্রামী মুক্তিকামী জনতার প্রতীক। শ্রেণিসংঘাত ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদের উল্লেখ এখানে প্রত্যক্ষ। উল্লিখিত কবিতাংশে তারই স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতার ভাষায় শ্লেষাত্মক পরিহাসও ফুটে উঠেছে —

"*এই ভঙ্গু, পঙ্গু নরকমিশ্রিত দেহর দুর্ভোগ*
আমি
গতিশীল শক্তির
পরম তৃপ্তিত
দিনে দিনে গঙ্গাস্নান করি
লভিছো মুক্তি।"
(এই ভগ্ন, পঙ্গু নরকমিশ্রিত দেহের দুর্ভোগ
আমরা
গতিশীল শক্তির
পরম তৃপ্তিতে
দিনে দিনে গঙ্গাস্নান করে
পেয়েছি মুক্তি।)

অমূল্য বরুয়ার কবিতা সম্পর্কে ভবানন্দ দত্তের বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। "অমূল্য বরুয়ার কবিতা ছিল সেই সময়ের অভিজ্ঞতার প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্রণ। তাঁর 'বেশ্যা' কবিতায় মহাসমরের আঘাতে বিলাসী শ্রেণির নৈতিক অধঃপতিত জীবনের কদর্য রূপ ফুটে উঠেছিল।"

'জয়ন্তী'-র পাতায় ঘন ঘন যাঁর কবিতা প্রকাশ পেত তিনি হলেন হেম বরুয়া। তিনি রোমান্টিক কবিতার ভাববিলাস পরিহার করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তবে তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি বলে মনে হয়। হেম বরুয়ার কবিতায় 'তীব্র শ্রেণিবিদ্বেষ' প্রকাশের কথা স্বীকার করেও ভবানন্দ দত্ত এই মন্তব্য করেছিলেন যে "সেখানে ছোটলোকের ব্যক্তিগতভাবে ধনী হওয়ার কামনা বা ধনী না-হতে পারার আক্রোশ আছে, কিন্তু ছোটলোকের জীবনের গভীর মূল্যবোধের পরিচয় নেই।" সে-কারণেই হেম বরুয়াকে তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক রোমান্টিক বলে মন্তব্য করেছিলেন। আমাদেরও মনে হয় হেম বরুয়া সমাজ-বাস্তবতাকে শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। কিন্তু কবিতার আঙ্গিকে হেম বরুয়া বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং রোমান্টিক ভাবধারার কবিদের ব্যবহৃত শব্দসম্ভার সযত্নে পরিহার করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি পরবর্তী পর্যায়ের আধুনিকতাবাদী কবিদের খুব কাছের মানুষ ছিলেন।

পঞ্চাশের দশকে 'রামধেনু' সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়ার পরে আমরা অন্য একটি বিবর্তন লক্ষ করি। 'জয়ন্তী'-র কবিদের বিষয়চেতনা থেকে নতুন কবিদের কাব্যচর্চার প্রক্রিয়ায় বিষয়-সচেতনতা প্রাধান্য পেল। তাঁদের জন্য আধুনিক জীবনের স্বরূপ কেবল বহির্বাস্তবে দৃষ্টি ফেলেছিল বলে মেনে নেওয়া যায় না। বহির্বাস্তবের প্রতিক্রিয়া যেহেতু ব্যক্তিমনে হয় সেহেতু সেখানে ব্যক্তিমনের সাড়া বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক ভূমিকা আছে। সংশ্লিষ্ট কবিরা অবশ্য রোমান্টিকদের সৌন্দর্যসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি পুনরায় মোহাবিষ্ট হয়ে ফিরে যাননি। এঁদের কবিতায় ফুটে উঠল অধিকতর আত্মসচেতনতা, যেখানে আবেগ-অনুভূতি বৌদ্ধিক রসায়ন-প্রক্রিয়ায় নিমজ্জিত হল। আধুনিকতা ও আধুনিক জীব সম্পর্কে এঁদের সংবেদনশীল মনে নানা প্রশ্নের উদয় হল। আধুনিকতার বিশৃঙ্খলার আড়ালে শৃঙ্খলার সন্ধান চলল। আর সে-কারণেই হয়তো শ্রেণিসংগ্রামের বিষয়টি এ-জাতীয় কবিতার বিষয় থেকে দূরে রয়ে গেল। তখন থেকে বামপন্থী কবিতার ধারা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে।

অসমিয়া সাহিত্যে ধারাবাহিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। 'জয়ন্তী' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে প্রগতিবাদী কবিতার ধারা কিন্তু একেবারে শুকিয়ে যায়নি। পরবর্তী সময়ের কয়েকজন কবি বামপন্থী ও আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তাঁদের মধ্যে কেশব মহন্ত ও নলিনীধর ভট্টাচার্য অন্যতম। তবে কেশব মহন্তের কবিতার প্রাণস্পন্দনে শ্রেণিচেতনার চেয়ে লোকজীবনের স্পন্দিত ছন্দই বেশি অনুভূত হয়। তাঁর 'সোনজিরা মাহী' কবিতায় লুমুম্বার মৃত শিশুটির সংবাদ পেয়ে সোনজিরা মাসি প্রশ্ন করে, "কোন্ এই মরা কেচুয়াটি/কোন্ তার মাক?/তার পিতাকেই বা কোন্?/জানোবা সিহঁতো কোনোবা মোরেই আপোন।" (কে এই মৃত শিশুটি/তার মা কে/তার পিতাই বা কে/হয়তো তারাও কেউ আমারই আপন।) এখানে শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে মানবতাবোধের সুরই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

॥ তিন ॥

অসমিয়া কবিতায় আধুনিকতাবাদ

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে অসমিয়া কবিতায় দেখা গেল নতুন এক ধারা। পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবে ঐশী ভাবনা থেকে মানব-কেন্দ্রিক চিন্তায় শিক্ষাদীক্ষা লাভকারী অসমিয়া সম্প্রদায়ের জনগণের চেতনা ফেরাতে নতুন কবিতার সৃষ্টি হয় এবং সেখানে রোমান্টিক ভাবধারা ও কাব্যরীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। চল্লিশের দশকে যে-বিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল তাতে 'জয়ন্তী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে-সব কবির আবির্ভাব ঘটে তাঁরা ছিলেন মার্ক্সবাদের দ্বারা প্রভাবিত। জয়ন্তী পত্রিকা ওই কবিদের প্রগতিবাদী আখ্যা দিয়েছিল বলে ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এটাও সত্যি যে 'জয়ন্তী'-র প্রভাব ততটা ব্যাপক হয়নি। ১৯৫০ সালে 'রামধেনু' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই নতুন কাগজ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষকতায় এক শ্রেণির নতুন কবিরও আবির্ভাব হল। পত্রিকাটি জন্মলগ্ন থেকে (১৯৫০) টানা ১৭ বছর অর্থাৎ ১৯৬৭ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় এবং তারপর বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় ১৯৭১ সালে নতুন পর্যায়ে প্রকাশের কাজ শুরু হয়। কিন্তু দু-বছর পর ১৯৭৩ সালে 'রামধেনু' সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

গত শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অসমিয়া আধুনিক কবিতার উপর যে-প্রভাব পড়েছিল তা উক্ত পত্রিকার মৃত্যুর পরও নিঃশেষ হয়নি। এই সময়ে অসমিয়া কবিতার যে-ধাঁচ গড়ে ওঠে তার বিশেষ পরিবর্তন এখনও চোখে পড়ে না। সে-কারণেই আধুনিক অসমিয়া কবিতার তিনটি বিবর্তনের এই পর্বটিকে সর্বশেষ বলে আখ্যায়িত করা যায়। অবশ্য ধাঁচ বা গঠন-প্রক্রিয়ার পরিবর্তন না-করেও বিভিন্ন কবি তাঁদের নিজস্ব মেজাজ অনুযায়ী কবিতার প্রকাশভঙ্গিতে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। 'রামধেনু'-র চর্চার মাধ্যমে প্রকাশিত এইসব নতুন কবিতাকে আধুনিকতাবাদী কবিতা হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

প্রগতিবাদী কবিদের চিন্তার সূচনায় ছিল শ্রেণিচেতনা। কিন্তু আধুনিকতাবাদীদের মনমেজাজ ব্যক্তিচেতনার দিকে ফিরে আসে। অবশ্য রোমান্টিকদের সৌন্দর্যসন্ধানী দৃষ্টি এবং জগতের প্রতি প্রসারিত মনের আবেগিক প্রকাশের পরিবর্তে তাঁদের কবিতায় বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হল আত্মসচেতনতা— যেখানে আবেগ-অনুভূতি বৌদ্ধিক রসায়নের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করল। ভারত-মার্কিন আধুনিকতাবাদী কবি টি. এস. এলিয়ট এবং এজরা পাউন্ডের দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চার দ্বারা তাঁদের কাব্যানুশীলন বিশেষভাবে প্রভাবিত হতে শুরু করে। শব্দসন্ধানের ক্ষেত্রে এঁরা প্রতীকবাদী, চিত্রকল্পবাদী ও মেটাফিজিক্যাল কবিতার পরীক্ষা তথা প্রয়োগের প্রতি অদ্ভুতভাবে আকৃষ্ট হলেন।

হেম বরুয়া তাঁর 'আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, "আধুনিক সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গিতে আধুনিক যুগের ব্যক্তিগত প্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে আছে।... কবিতার বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গিতে পাউন্ড, এলিয়ট, সিটোয়েল প্রমুখ স্বতন্ত্র ধরনের পৃথক স্বাক্ষর রেখেছেন।" এই প্রবন্ধেই তিনি উল্লেখ করেছেন যে আধুনিক সাহিত্যিকরা নতুন যে-জগৎটির সন্ধান করে থাকেন সেই পৃথিবী 'কল্পনার নয়, বাস্তবের'। আধুনিকতাবাদী কবির এই বাস্তবক্ষেত্রটি কিন্তু প্রগতিবাদী কবির দৃষ্টি থেকে শ্রেণিদ্বন্দ্বের সমাজবাস্তবতা নয়। বরং কবির ব্যক্তিমনের তীব্র ভাবানুভূতির মধ্য দিয়ে অনুভূত আধুনিক জীবনের বাস্তবতা। প্রগতিবাদী কবিতার অন্যতম প্রধান দিগ্‌দর্শক ভবানন্দ দত্ত এই নতুন কবিদের 'শব্দর মেরপাক' (শব্দের কারুকাজ), 'বাগাড়ম্বর' (বক্তব্যপ্রধান) ও 'বিচ্ছিন্ন কল্পনার কারসাজি' নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও দেখা গেল যে 'রামধেনু'-র পৃষ্ঠপোষকতায় এই আধুনিকতাবাদী কবিতার চিন্তাচর্চাই তখনকার তরুণ কবিকুলের মধ্যে প্রোথিত হয়ে আছে। বাংলা ভাষায় বিশের দশক থেকেই কবিতার রীতি ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যে-ধরনের পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে এবং রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা এক নিজস্বতার আকার নিতে আরম্ভ করে তার প্রভাবও আধুনিক অসমিয়া কবিতার উপর পড়ে। বিশেষত এই সময়ে আধুনিক কবিতার উপর দীপ্তি ত্রিপাঠীর গবেষণামূলক গ্রন্থটি প্রকাশ পাওয়ায় তাঁর বিশ্লেষণও তরুণ অসমিয়া কবিকুলকে নিশ্চিতভাবে টেনেছিল। যা হোক, এই তৃতীয় পর্বের বিবর্তনে আধুনিকতার প্রতি ব্যক্তিমনের ভাবাদর্শ রোমান্টিক ও প্রগতিবাদী কবিতার চেয়ে ভিন্ন চেহারা পায়। কাব্যরীতির ক্ষেত্রে এইসব কবি সচেতনভাবে উপলব্ধিকে নৈর্ব্যক্তিক হিসাবে প্রকাশের এক পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। এঁরা আধুনিকতার (modernity) প্রতি যে-আগ্রহ বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন সেখানে রোমান্টিকদের মতোই কবিমনের ব্যক্তিগত সাড়া থাকলেও তা কেবল রোমান্টিক ধাঁচের আবেগেই পর্যবসিত হয়নি। আগেই বলা হয়েছে যে এই

আগ্রহ বা সাড়া বৌদ্ধিক চিন্তার রসায়ন স্পর্শ করেই আসতে শুরু করে।

প্রগতিবাদী কবিরা মার্ক্সীয় দর্শনের আধারে বাস্তব জীবনকে নিরীক্ষণ করে তার অর্থনৈতিক ভিত-এ মধ্যবিত্তের প্রবল অবস্থানের হদিশ পান এবং শ্রেণিবিভক্ত সমাজে তাঁদের নান্দনিক ভূমিকাটিকে সর্বহারার সহযোগী করে তোলেন। অন্যদিকে আধুনিক জীবনের দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে সেই সময়ের কবিকুল জীবন-জগতে আধুনিকতার সঙ্গে আগত জটিল পরিবর্তনের প্রতিও নজর দিয়েছিলেন এবং এই জটিলতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সংবেদনশীলতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কাব্যিক ত্রুটির সন্ধান করেন। আধুনিক জীবনের জটিলতা যে অনিশ্চয়তা, শঙ্কা ও বিশৃঙ্খলার আপাতদৃষ্ট স্তরের জন্ম দিয়ে থাকে তার ভিতরে কী শৃঙ্খলা আছে তারও অনুসন্ধানে রত হন ওই কবিকুল। এই কবিরা প্রতীকবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁদের কবিতায় প্রতীক ব্যবহার রোমান্টিক কবিতার প্রতীক ব্যবহারের চেয়ে ভিন্ন হয়। রোমান্টিক কবিতার প্রতীক এসেছিল রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধানে, সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধিতে। আধুনিকতাবাদীর কবিতায় প্রতীক এসেছে অভিধার মধ্য দিয়ে অপ্রকাশ্য উপলব্ধিকে মূর্ত করার প্রয়োজনে আর সেটা এল ভাষার ধ্বনিগত ব্যঞ্জনার ওপারের অন্য এক প্রতীকী স্তরের সন্ধানে। এর জন্য প্রকাশভঙ্গি হল তির্যক। চিত্রের নির্মাণ শুরু হল বৌদ্ধিকভাবে এবং তার অবলম্বন হল উৎপ্রেক্ষাধর্মী অর্থালংকার। রোমান্টিক কবিতায় ব্যবহৃত বিশ্লেষণধর্মী শব্দালংকার পরিহারের চেষ্টা করা হল। রোমান্টিক শব্দচয়ন থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াসের ফলে সার্থক কবিদের প্রকাশভঙ্গিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে লাগল। আবেগকে সংহত করার প্রচেষ্টার ফলে ভাষায় চলে এল 'আয়রনি'-র ব্যবহার, উক্তিতে এল বিরোধাভাস— আর তা এল কাব্যপঙ্‌ক্তির অর্থের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে মানসিক অনিশ্চয়তা প্রকাশের তাগিদে। জীবনের আপাত ভগ্ন রূপ— এলিয়ট যাকে বলেছেন 'a hope of broken image'— তার অসংলগ্নতাকে সংলগ্ন করার জন্য আপাত-সম্পর্কহীন ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকল্পকে যুগপৎ উপস্থাপন করার এক রীতি প্রয়োগ শুরু হল। এই চিত্রকল্পগুলিকে অভিধার স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে দেখার ফলে সাধারণ পাঠক তা 'দুর্বোধ্য' মনে করতে থাকে। তবে বুদ্ধিদীপ্ত পাঠকগণ সেখানে একটি তাৎপর্যের ঐক্যসূত্র খুঁজে পেলেন।

আধুনিকতাবাদী কবিতায় কবিতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল আর তার ফলে ফর্ম নিয়ে বেশ নাড়াচাড়া শুরু হল। এইসব কবিতায় এলিয়টের নৈর্ব্যক্তিকতার ধারণার প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে। এলিয়ট বলেছেন "Poetry is not turning loose of emotion, but an escape from emotion." তাঁর মতে কবিতায় প্রকাশের জন্য কবির কোনো 'ব্যক্তিত্ব' থাকে না। কবিতা হল কবির জন্য একটা মাধ্যম মাত্র এবং কবির (তিনি আর্টিস্ট বলে আখ্যা দিয়েছিলেন) বিকাশে ঘটে ক্রমাগত আত্মত্যাগ ও ব্যক্তিত্বের ক্রম-নির্বাপণে (a continual extinction of personality)। তিনি ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের 'spontaneous overflow of powerful feeling' কথাটি ব্যাখ্যা করে সেটিকে এক 'dumping ground of emotion' বলে মন্তব্য করেছেন। এলিয়টের এমনতরো ধারণা অসমিয়া আধুনিকতাবাদী কবিদের আকৃষ্ট করতে শুরু করল এবং তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও অনুরূপ ধারণার প্রভাব পড়ল। তাঁরা নৈর্ব্যক্তিকতার প্রয়োজনে কবিতায় প্রথম পুরুষের উক্তিকারক 'মই' অর্থাৎ আমি)-এর কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। কবিতার 'মই' হল এক person, এক নির্মিত সত্তা, যার মধ্য দিয়ে আবেগ ও ধারণার একটি মিশ্রিত চিত্রকল্প এবং বাগ্‌ভঙ্গির ভিতর দিয়ে ব্যক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া কাব্যকৌশলে স্থান করে নিল। এই আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে রোমান্টিক কবিতার উক্তিকারকও একজন persona মাত্র, কাব্যোক্তির জন্য নির্মিত এক ভাষিক কৌশল। কিন্তু রোমান্টিক কবিরা তাঁদের কবিতার বুনিয়াদ বা কাব্য-প্রক্রিয়ার প্রতি তেমন সচেতন ছিলেন না। তাঁদের কবিতার উক্তিকারক ('মই') তাঁদের নিজের থেকে পৃথক হোক তা চাননি। এই সত্তা তাঁদের জন্য ছিল কবিহৃদয় থেকে উচ্চারিত তীব্র আবেগ-অনুভূতির প্রকাশক। অন্যদিকে আধুনিকতাবাদীরা আত্মসচেতনভাবে কাব্যসৃষ্টির প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়ে কবি ও কাব্যিক সত্তার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টিতে প্রয়াসী হন। অর্থাৎ কবিতায় 'মই' (আমি) এক বিভক্ত আমি। এটা একদিকে কাব্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের একটি কৌশল, আবার অন্যদিকে এটি এমন এক কবিসত্তা যা ভাব-অনুভূতি বহন করে কবির বৌদ্ধিক-আবেগিক উপলব্ধিকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রক্ষেপের জন্য। এই 'মই' (আমি) একটি নির্মিত আমি, যাকে আধুনিকতাপন্থী কবিরা নিজেদের সঙ্গে একাকার করতে চাননি। রোমান্টিকতাবাদীদের মতে কাব্যিক উচ্চারণের স্রষ্টা কবি স্বয়ং। আধুনিকতাবাদীদের মতে কবিতা আদৌ সৃষ্টি

বা নির্মাণ কি না সে-বিষয়ে দ্বিধা রয়েছে। একে এক কাব্যিক নির্মাণ হিসাবে গ্রহণ করলেও কবি কিন্তু এটিকে তাঁর দ্বারা 'ভাষার ব্যবহার' বলে মনে করেন। ভাষার স্বতন্ত্র নির্মাণ (যেখানে কবি কেবল একটি মাধ্যম মাত্র)— এমনতরো কথা অবশ্য আধুনিকতাবাদী কবিরা বলেননি। সংশ্লিষ্ট কবিদের ধারণা এমন— আবেগের আবির্ভাবে কবির মনে যে-সংবেদনের সৃষ্টি হয় সেটিকে বৌদ্ধিক স্তরে উন্নীত করা প্রয়োজন, কারণ তার ফলে কবিসত্তায় এক বোধের সৃষ্টি হয়। এই বোধকে প্রকাশ করতে যথেষ্ট শব্দের প্রয়োজন, যা সরাসরি মেলে না। এবং সে-কারণেই চিত্রকল্প ও প্রতীকের মধ্যে উপযুক্ত প্রতিরূপ সৃষ্টি করা হয়। কবিসত্তায় সৃষ্টিশীল কল্পনা যে-বোধের জন্ম দেয় সেই বোধ নির্মিত হয় ভাষায়। সৃষ্টিকারী মন এবং তাকে নির্মিত রূপ দানকারী কবি যেন বিভাজিত হয়েও এক— এমন একটা দ্বিধা আধুনিক কবিতার নির্মাণ-প্রক্রিয়ায় লক্ষ করা যায়। নবকান্ত বরুয়ার 'রত্নাকর' এক রূপান্তরের কবিতা। একটি স্তরে কাব্যিক প্রক্রিয়ায় বৌদ্ধিক-আবেগিক সংবেদনাকে যেন বিশেষভাবে করা এক রূপান্তর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া 'সৃষ্টি না কি নির্মাণ'— এ-কথাটি কবি দ্বিধাবিভক্ত করে রেখেছেন, যেন আধুনিকতাবাদী সংবেদনারই এক রূপক এই কবিতা। আধুনিকতাবাদী কবি কল্পনার সৃষ্টিশীল শক্তিকে অস্বীকার না-করলেও রোমান্টিক কবিদের মতো তার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবেগকে বৌদ্ধিক চিন্তার ছাঁকনির মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। ফলে ধ্বনিস্পন্দনে আবেগকে আলোড়িত করার চেয়ে চিত্রকল্পের মধ্যে তা সংহত করার চেষ্টা করে থাকেন।

আধুনিকতাবাদী কবিতায় পাঠককে কবিতার নির্মাণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হতে হয়, কারণ কবিতার বক্তব্য থেকে প্রক্রিয়াকে পৃথক করে দেখলে তার তাৎপর্য সেভাবে ধরা পড়ে না। অজিৎ বরুয়ার 'মন-কুঁঅলী সময়' (মন-কুয়াশার সময়) কবিতাটিকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কবিতাটি ব্যক্তিমনে এক বিশেষ মুহূর্তের উপলব্ধির অভিজ্ঞান। 'এক পলকর দলং' (এক পলকের সেতু)-এ সংযোজিত হয়েছে দুটি পৃথক সময়ের মানসিক অভিজ্ঞতার স্মৃতি। এই সংযোজন ওঅর্ডস্ওঅর্থের একই স্থানের এক অভিজ্ঞতার উপর অন্য একটি সময়ের অভিজ্ঞতার সমারোপণ (superimposition) নয়। কবিতাটির মধ্য দিয়ে অজিৎ বরুয়া তাঁর এই উপলব্ধির স্বরূপ বর্ণনা করার চেষ্টা করেননি। বরং 'এক-পলকের-সেতু'-তে সময় থমকে যাওয়ার উপলব্ধির শেষে একটি সজ্ঞান প্রশ্নবোধক চিহ্নই বিরাজমান— আর এই চিহ্নটি কেবল এক যতিচিহ্নই নয়, বন্ধনীর মধ্যে এটিকে বিশেষ ব্যঞ্জনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যদি কোনো পাঠক কবিতাটিতে বক্তব্যের সন্ধান করে তাহলে সেই বক্তব্য এই প্রশ্নবোধক চিহ্নের ভিতরেই খুঁজতে হবে। প্রশ্নবোধক চিহ্নটি দুটি অভিজ্ঞতার সংযোগস্থলে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বক্তব্য খুঁজতে গিয়ে পাঠকরা লক্ষ করবেন যে সজ্ঞান প্রশ্নবোধক চিহ্নটি একটি বন্ধনীর মধ্যেই রাখা হয়েছে এবং তার পরে কয়েকটি বিন্দুচিহ্ন, অর্থাৎ এই প্রশ্নেই এর শেষ নয়, তার পরেও যেন আরও কিছু আছে। প্রশ্নটি কবিতার বিষয়ীর (persona) নিজের প্রতি জিজ্ঞাস্য যেন কোনো শব্দের মধ্য দিয়ে নয়, ভ্রূকুটির মাধ্যমেই উপস্থাপন করা হয়েছে। বিন্দুগুলোর জন্য এই প্রশ্নে এক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। সময় স্থির হয়ে যাওয়া 'এক পলকের সেতু'-র (যা এক মানসিক অবস্থার রূপক) 'থাকা না-থাকা'-য় অনিশ্চয়তা থাকে কেমন করে?

এখানে এক বৌদ্ধিক-আবেগিক গ্রন্থির তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা চিত্রকল্পে স্তব্ধ হয়ে তাৎক্ষণিকতার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। কবিতাটিতে 'মন-কুঁঅলী' (মন-কুয়াশা), 'ধোয়া-রাতিপুআ' (ধোয়া-সকাল), 'কুঁঅলী-গলি' (কুয়াশা-গলি) ইত্যাদি জোড় শব্দ রয়েছে এবং এই দুটিকে পৃথক করলে তার তাৎপর্য ব্যাহত হয়। তবে একটি শব্দ অপরটির বিশেষণের দায়িত্ব পালন করেছে বলেও ধরে নেওয়া যায় না। ইংরেজ কবি জেরাল্ড ম্যানলি হপকিন্সের কবিতায় ব্যবহৃত জোড়-শব্দগুলির মতো এখানেও এ-রকম ব্যবহার লক্ষণীয়। কবিতাটির শেষে একটি বাক্য রয়েছে— 'গুনগুন করে ধোঁয়া উঠেছিল'। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতির এমন মিশ্রণ ঘটেছে যে-ধরনের মিশ্রণ ফরাসি কবি বোদলেয়ারের কবিতায় প্রায়শ লক্ষ করা যায়। গুনগুন করে শব্দ শোনা যায় কানে, ধোঁয়া অস্পষ্টভাবে দেখা যায় চোখে। শ্রুতিতে ব্যবহৃত ক্রিয়া-বিশেষণকে দৃষ্টিতে ধৃত একটি ছবিতে স্থানান্তরিত করে ছবি ও ধ্বনির সংমিশ্রণ করা হয়েছে। এই বাক্যের শেষের শব্দ 'উঠিছিল' (উঠেছিল)-এর প্রতিটি অক্ষর একটা থেকে অন্যটাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। লিখিত স্থানে সৃষ্ট এই দূরত্ব কালের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করেছে। বর্তমান অভিজ্ঞতার একটি ছবি (অতীতের সঙ্গে) সংযোজিত হয়ে সেই পলকটিতে দীর্ঘ অনুরণনের সৃষ্টি করেছে। কবিতাটিতে সময়ের এই ব্যবহার সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক,

ঘড়ির কাঁটার নির্দিষ্ট গতির সময় প্রবাহ নয়। কবিতাটিতে 'নীরব গধূলি পথারর মাজত অকলে থিয় হোআ' (নীরব গোধূলির মাঠের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকা) বাক্যটি অসমাপিকা ক্রিয়ায় অসমাপ্ত হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ বিষয়ীর উপলব্ধি শেষতম উপলব্ধি নয়।

নিবিড় জটিল বোধের উন্মোচনে আধুনিকতাবাদী কবি বাগ্‌বিস্তারের বিরোধিতা করেন, প্রতিটি শব্দের দ্যোতনাময় ধর্মকে উপলব্ধির বাহক হিসাবে গণ্য করেন এবং তার অনুশীলন করেন জটিল বোধের কারণেই। তেমন একটি প্রক্রিয়াই অজিৎ বরুয়ার উল্লিখিত কবিতায় ফুটে উঠেছে। এলিয়ট, হপকিন্স ও ফরাসি কবি লাফর্গ-এর প্রভাব কবি অজিৎ বরুয়া আত্মস্থ করেছেন এভাবেই।

ধ্বনির লয় থেকে সরে এসে গদ্যছন্দের দিকে ঘেঁষার জন্য অসমিয়া আধুনিকতাবাদী কবিতা বেশি চিত্রকল্পপ্রধান হয়ে পড়েছে। এ-ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন চিত্রকল্পবাদের প্রভাব অসমিয়া কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু হীরেন ভট্টাচার্যের চর্চা ও ধারণা এর ব্যতিক্রম। তাঁর কবিতায় ধ্বনিস্পন্দনের বেশি প্রাধান্য দেখা যায় এবং তাঁর কবিতার ছবি melopoea বা ধ্বনির লয়-লাস্য গতিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস পায় না। তিনি ছন্দসজ্জার ব্যবহার না-করে অনুপ্রাসের কৌশলকে হাতিয়ার করেন। এ-ক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— "কবিতার শব্দ কেবল শব্দই নয়, তা ধ্বনিও, কবিকণ্ঠের শব্দ যখন প্রতিধ্বনি হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসে তা যেন সেই পুরনো অবয়বেই। শব্দের এই বেড়ে আসাই হল কবির নির্মাণ... শব্দের শিল্প কবিতার মুদ্রিত অক্ষরেই আবদ্ধ নয়। এটি যে কণ্ঠেরও শিল্প।" অন্যদিকে অজিৎ বরুয়া তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'কিছুমান পদ্য আরু গান' (কয়েকটি পদ্য ও গান)-এর ভণিতায় বলেছেন, "শব্দের ব্যবহারই সব।... ভাষা? লেখার পরম মুহূর্তে সে হবে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর কথা বলার ভাষা। কিন্তু সমস্ত শব্দের সেখানে যথাযথ স্থান থাকবে, সুরও হবে কথোপকথনের। সাধারণ কথার ভেতরেই একটা অসাধারণত্ব ফুটে-ওঠা ভাষা। অসাধারণত্ব আসবে লেখকের লজ্জিত তড়িৎস্পর্শে।" এই দুজনের উক্তিতে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু দুটি উক্তির মধ্য দিয়ে এটা উপলব্ধি করা যায় যে আধুনিকতাবাদী কবিরা অত্যন্ত ভাষা-সচেতন হয়ে পড়েছিলেন। আর তার প্রভাবও ওই কবিদের কবিতার আঙ্গিকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, আধুনিকতাবাদী কবিতার ক্ষেত্র নির্মাণে 'রামধেনু' এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ১৯৫৪-৫৫ সালে সপ্তম বছরের সম্পাদকীয় নিবন্ধে আধুনিক কবিতার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং সেই সময়ের প্রগতিবাদী ও আধুনিকতাবাদী দুটি ধারার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে লিখেছিলেন— "একদিকে একাংশ কবি ব্যক্তির নিঃসঙ্গ দিকটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে অন্যরা চেষ্টা করছেন সামাজিক রূপান্তরের।" উভয়বিধ কবিতার নতুনত্ব ও দুর্বলতার প্রতিও লক্ষ্য ছিল তাঁর এবং সে-দিকটি তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "একান্ত নিজের ভাষা, যুগোপযোগী চিত্রকল্প, নতুন খণ্ডবাক্য ও আকর্ষণীয় প্রকাশভঙ্গির সৃষ্টি কাব্যরীতিতে একটি যুগান্তর এনেছে। কাব্য-উপেক্ষিত বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে কবিরা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কাব্যে স্থান দিয়েছেন, কিছু কিছু কবিতার দ্বারা সামাজিক অন্যায়, অসাম্য ও শোষণ দূরীভূত করার মানসে মানুষের মনে সক্রিয় অনুভূতি জাগাবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা।"

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের বক্তব্য অনুযায়ী অসমিয়া আধুনিকতাবাদী কবিতায় 'ব্যক্তির নিঃসঙ্গ জীবন'-এর অভিব্যক্তি প্রকাশ পেলেও মহানগরীয় জীবনের নিঃসঙ্গতার ছবি সেখানে খুব বেশি পরিলক্ষিত হয় না। পঞ্চাশের দশকে গুয়াহাটি শহর শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠার ফলে অসমিয়া তরুণসমাজ অধ্যয়নের জন্য এখানে ভিড় করতে থাকেন এবং কটন কলেজ তাঁদের চিন্তাচর্চার প্রাণকেন্দ্র হয়ে পড়ে। ইংরেজি ও বাংলা আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের যে-সংস্পর্শ ঘটে তাতে তাঁদের কবিতায় এক আকৃতির হদিশ মেলে। কিন্তু গুয়াহাটি শহরে তখনও মহানগরীয় জীবনের দ্রুততা, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি প্রকট হয়ে পড়েনি। পড়াশোনার জন্য আগত তরুণদের গ্রামজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং সম্পূর্ণ নাগরিক জীবনের মনোভাব তাঁদের মানসিক চিন্তাচর্চায় ব্যাপ্তি লাভ করেনি। কিন্তু নগরকেন্দ্রিক আধুনিকতার প্রতি ব্যক্তিমনের সচেতন সাড়া নবকান্ত বরুয়ার একাংশ কবিতায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর এই বোধের কেন্দ্রে ছিল কলকাতা (অসমিয়াতে তখন 'কলিকতা' বলা হত)। নবকান্তের 'হে অরণ্য, হে মহানগর'-এ অরণ্য মহানগরের উৎপ্রেক্ষায় পর্যবসিত। তার অভিব্যক্তিও মেলে 'কাজিরঙা, ডবকার অরণ্য অপস্মার', 'সরীসৃপ ক্রূর মৃত্যু', 'সর্পিল জীবন' প্রভৃতি উল্লেখের মধ্যে। এমন বর্ণনার

পাশাপাশি উচ্চারিত হয়েছে আধুনিক নগর-জীবনের তিনজন যুবতী 'হেনা', 'মধুমালা' ও 'অলকানন্দা'-র কথা। কবি তাদের চেহারার বর্ণনায়ও রোমান্টিক আবেগে ফুটিয়ে তোলেননি তাদের 'রঙা নীলা শেঁতা মুখ' (লাল নীল সাদা মুখ)। এখানে বর্ণনা অনিশ্চিত। প্রকৃতপক্ষে তাদের মুখের আদল কী ধরনের তা স্পষ্ট নয়। অরণ্যকে মহানগরের উৎপ্রেক্ষার ধারণা নবকান্ত বরুয়ার নিজের নয়। এটা 'কংক্রিটের জঙ্গল' কথারই যেন প্রতিধ্বনি। কিন্তু কবিতাটিতে এই কংক্রিট জঙ্গলের স্বরূপ যেভাবে মূর্ত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে নগরজীবনের বিরোধাভাস ফুটে উঠেছে। কণ্ঠরোধকারী ট্রাফিকের সঙ্গ হয়ে উঠেছে অরণ্যে রক্তচক্ষুর শ্বাপদ (বাঘ ইত্যাদি)। সেখানে 'ভয় ও অবিশ্বাসের জটিল উৎকণ্ঠা' কবিতাটির চিত্রকল্পে আধুনিক নগরজীবনের বিপরীতমুখী উৎকণ্ঠা ও আকর্ষণ, ভয় এবং আশ্বাস পরিহাসময় হয়ে ফুটে উঠেছে। কবিতার বিরোধাভাসে দেখা যায় নগরের ট্রাফিকে আছে স্পন্দনও। কলকাতা মহানগরের বাণিজ্য-কেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের আকর্ষণ-বিকর্ষণের পরস্পরবিরোধী অনুভূতি এই কবিতার জটিল চিত্রকল্পে পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে 'জীবন জীয়াই (বেঁচে) থাকে', কিন্তু সঙ্গে বেঁচে থাকে 'জীবিকার গলির সাঁথব' (জীবিকার গলির রহস্য)। শহরের জীবনের বিরোধাভাস নবকান্ত বরুয়ার কবিতায় যেমনটি ধরা পড়েছে ঠিক তেমনটি না-হলেও বীরেশ্বর বরুয়ার কিছু কবিতায় নগরজীবনের ক্লান্তি উপমার মধ্য দিয়ে চিত্রকল্পের রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর একটি কবিতায় দেখা যায় "কর্মক্লান্ত যন্ত্রর/এক সুরীয়া শব্দ আহি/মোর বুকুত ঠেকা খাইছে/যেন রাতির কোআরি ফালি/নির্বাসিত হৈছে পরীয়া কুকুরর আর্তনাদ।" (কর্মক্লান্ত যন্ত্রের/এক মধুর শব্দ এসে/আমার বুকে দিয়েছে ধাক্কা/যেন রাতের নীরবতা ভেঙে/নির্বাসিত হয়েছে পোষা কুকুরের আর্তনাদ।) নাগরিক জীবনের ক্লান্তি এসেছে এই জীবনের যান্ত্রিকতা থেকে।

একাংশ আধুনিক অসমিয়া কবির কবিতায় অতীতের দিকে ফিরে দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নবকান্ত বরুয়া, অজিৎ বরুয়া, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কেশব মহন্ত প্রমুখ কবিদের কবিতায় অতীত জীবনের প্রতি আগ্রহ বা অতীতের স্মৃতিচারণ আছে। কিন্তু এই অভিলাষকে আমরা নস্টালজিয়া বলে মেনে নিতে পারি না। বর্তমানের জটিল অনিশ্চয়তা নিঃসঙ্গতা কখনো ক্রূর এবং কখনো-বা রিক্ত জীবনের স্থিতিকে অতীতের সহজ জীবনের সঙ্গে তুলনা করার কিংবা তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান জীবনকে উপলব্ধি করার প্রয়াস এ-রকম কবিতায় দেখা যায়। অনেক সময়েই অতীত হয়ে ওঠে বর্তমানের মেটাফোর। একটা সময়কে অন্য একটা সময়ের এবং একটি অবস্থাকে আর-একটি অবস্থার মেটাফোর রূপে গ্রহণ করা যায় না বলে ভাবা অনুচিত। যেমন আজকের ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌মের লেখকদের একটা উদ্ভট বা কাল্পনিক ঘটনাকে কখনো বাস্তবায়ন করে বাস্তব অবস্থার মেটাফোর করতে দেখা যায়। ইতিপূর্বে উল্লেখিত 'মন-কুঁঅলী সময়' কবিতায়ও অতীত আছে, কিন্তু সেই অতীতের স্মৃতি নস্টালজিয়া হয়ে পড়েনি। অতীত স্মৃতি উদ্‌বেলিত হয়ে বর্তমানকে ম্লান করে দেয়নি।

আধুনিকতাবাদী পর্বের অন্যতম প্রধান কবি হলেন নীলমণি ফুকন। তাঁর কবিতার আধুনিকতায় নগর-চেতনা নেই। এক রোমান্টিক মেজাজের বিস্ময়বোধ তাঁর কবিতায় প্রায়ই দেখা যায়। অথচ তিনি আধুনিক। এলিয়টপন্থী আধুনিকতার ধারণায় রোমান্টিকতা-বিরোধ লক্ষ করা যায়। কিন্তু এলিয়টের নৈর্ব্যক্তিকতার ধারণার প্রভাব থাকলেও অসমিয়া কবিতায় প্রতীকবাদেরও প্রভাব পড়েছে এবং বহু ক্ষেত্রে প্রতীকবাদ রোমান্টিকতাবাদের এক সম্প্রসারিত রূপ। প্রতীকবাদে যেভাবে আপাতবাস্তবের আড়ালে এক আদর্শ জগতের হদিশ মেলে, তেমন হদিশ নীলমণি ফুকনের কবিতায়ও পরিলক্ষিত হয়। নিজের অন্তর্দৃষ্টির আলোয় বিশ্বের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে নীলমণি নতুন কলা-কৌশলের সন্ধান এবং নতুন করে ভাষার পরীক্ষার প্রয়োজন বোধ করেছেন। কাব্যিক সত্যের সন্ধানে তিনি প্রতিবাদীদের মতো হলেও কাব্যরীতির ক্ষেত্রে চিত্রকল্পবাদী কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন। চিত্রবাদীদের ক্ষেত্রে রজার ফাউলারের বক্তব্য অনুযায়ী "the poem projected by imagism is a laconic complex in which painting or sculpture seem as if it were just coming over into speech"— এই কথাগুলি নীলমণি ফুকনের কবিতার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। চিত্রকল্প ও ভাস্কর্যের সঙ্গে সংযোগের ফলে নীলমণির প্রতিভা খুব সহজেই চিত্রধর্মিতাকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। অর্থালংকার ব্যবহারে বাহুল্য বর্জন এবং বাক্‌সংযম তাঁর অনুশীলনের অঙ্গ হয়েছিল, আর এর মধ্য দিয়ে তাঁর ভাষা তীব্রভাবে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছিল। স্পেনের কবি লোরকার কাব্যচিন্তা এবং জাপানি হাইকু, সেইসঙ্গে তাং যুগের চিনা কবিতার বাক্‌সংযম ও তীব্র ইঙ্গিতময়তাও ফুকনের কবিসত্তাকে আলোড়িত করতে দেখা যায়। তাঁর লিরিকধর্মী একেকটি পূর্ণ কবিতা যেন একাধিক চিত্রকল্পের ইঙ্গিতময় সমষ্টি, যার মধ্যকার

শূন্যস্থান জুড়ে যেন একটি নীরব নাটক চলতে থাকে। 'ওলমি থকা গোলাপ জামুর লগ্ন' (ঝুলন্ত গোলাপজামের লগ্ন) কবিতায় এক প্রকাশাতীত উপলব্ধির অনির্বচনীয়তা আছে, যেখানে বিস্ময়বোধ ব্যাপ্ত। এই অমূর্ত উপলব্ধিকে মূর্ত করে তুলতে কবি অভিনব মেটাফোর-এর সাহায্য নিয়েছেন। কবির বিস্ময়-বিহ্বল উপলব্ধিতে এসেছে 'কাহানিও নিনাদিত হৈ নুঠা কিছুমান শব্দ' (কখনো ঝংকৃত না-হওয়া কিছু শব্দ)। শ্রবণে অপ্রবেশ্য সেই 'কিছুমান শব্দ'-এর রূপ দৃষ্টিগোচর করতে কবি নানা ধরনের প্রতিরূপ খুঁজেছেন 'গোলাপী জামু' (গোলাপজাম), 'সামুদ্রিক চরাই' (সামুদ্রিক পাখি), 'তপত লাভা' (তপ্ত লাভা), 'পাগলাদিয়া' (একটি খরস্রোতা নদীর নাম), 'বাঁহী' (বাঁশি) ইত্যাদির মধ্যে। এইসব প্রতিরূপের মাধ্যমে যে-চিত্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে তাতে এক ধরনের ধ্বংসজড়িত (ভয়ংকর) সৌন্দর্য ধরা পড়ে। মেটাফোরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত এইসব প্রতিরূপ যে ক্ষণস্থায়ী সেই উপলব্ধি এসেছে কবিতার শেষ পর্যায়ে— যখন কবি শব্দসমূহের প্রাচীন শীতলতাকে সম্বোধন করেছেন। এখানে নীলমণি ফুকন রোমান্টিক কবির সংশ্লেষী কল্পনা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সংশ্লেষী কল্পনা বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়কে সংলগ্ন করে। আধুনিকতাবাদী কবি ফুকনের জন্য 'কাহানিও নিনাদিত হৈ নুঠা কিছুমান শব্দ'-এর স্বরূপ জটিল। তিনি উৎপ্রেক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকাশের অতীত বিষয়টিকে প্রকাশের মধ্যবর্তী স্থানে আনার প্রয়াস করেছেন। উপলব্ধির বাইরের স্তরের আড়ালে কী সারমর্ম রয়েছে তার সন্ধান তিনি করেছেন এবং ইঙ্গিতময় চিত্রকল্পের মাধ্যমে তার ভিন্ন ভিন্ন ছবি সংলগ্ন করে সেই সারবত্তাকে উদ্ভাসিত করে তুলতে চেয়েছেন। এখানে কল্পনা বিষয় ও বিষয়ীকে সংলগ্ন করেনি। বিষয়ী বিহ্বল দৃষ্টিতে ভাষার জাদুগুণে উপলব্ধ বিষয়কে মূর্ত করতে চেয়েছে। অর্থালংকারের ক্রিয়াময় শক্তির উপর তিনি নির্ভর করেছেন। ভাষার এই ব্যবহারের দ্বারা ক্ষণিকের মধ্য দিয়ে চিরন্তনকে উপলব্ধি করার প্রয়াস নীলমণির কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর কবিতার আধুনিকতা এখানেই।

হরি বরকাকতি ও নির্মলপ্রভা বরদলৈ-এর দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিক উৎস থেকে এলেও তাঁদের প্রকাশভঙ্গিতে নতুনত্ব ফুটে উঠেছে। কবি নির্মলপ্রভার মনের প্রক্ষেপ সৌন্দর্য সন্ধানের মধ্য দিয়ে আধুনিক জীবনের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। ষাটের দশক থেকে তাঁর রোমান্টিক জীবন-বীক্ষণে জটিল আধুনিক জীবন সম্বন্ধে সচেতনতার প্রবেশ ঘটে। সেইসঙ্গে ভাষার ব্যবহারে এসেছিল অসাধারণ পরিমিতিবোধ এবং উৎপ্রেক্ষাধর্মী অর্থালংকারের তির্যক ব্যঞ্জনা। তিনি রোমান্টিক সৌন্দর্যসন্ধান কখনো পরিত্যাগ করেননি। কিন্তু এটাও সত্যি যে তার সঙ্গে জুড়ে ছিল এক বৌদ্ধিক ঔৎসুক্য। এই সংযোগের মনোরম ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছিল অসংখ্য কবিতা। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে বারোটি মাস নিয়ে রচিত কবির ঋতু-বিষয়ক কবিতার সমাহার। এই কবিতাগুলিতে ঋতু-পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতির বর্ণময় রূপ দ্যোতনাময় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তবে বৌদ্ধিকভাবে চিত্রকল্পের ব্যবহার প্রতিটি মাসের একেকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ বিশেষ ইঙ্গিতময়তায় ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে স্পর্শ করেছে। মনে হয়, এ যেন একটি সৌন্দর্যেরই ভিন্ন ভিন্ন বারোটি রূপ। জ্যৈষ্ঠ, পৌষ, চৈত্র ইত্যাদির উগ্রতার অন্তরালেও আবিষ্কৃত হয়েছে এক সমাহিত সৌন্দর্যময় রূপ। এই রূপান্তরে রোমান্টিক কল্পনার স্পর্শ লেগেছে। কিন্তু এর ভাষাপ্রয়োগ আধুনিক, চিত্রকল্পবাদের প্রভাবে ভাবচিত্রের সৃষ্টি।

লোকজীবনের স্পন্দন নির্মলপ্রভার কবিতায় অন্তঃসলিল হয়ে থাকে। এমন-কি জীবনের শেষদিকে কিছু কবিতায় দার্শনিক অনুসন্ধানেরও প্রকাশ লক্ষ করি আমরা। কয়েকটি কবিতায় সত্য সম্বন্ধে কবির নিজস্ব বোধ উপলব্ধ হয়। যে-বোধ ছিল কবির সামগ্রিক জীবনবোধের অঙ্গ।

হরি বরকাকতির কবিতার 'সোনপাহী' আগাপাশতলা অসমিয়া নাম। পাশাপাশি ভালোবাসার নারীর প্রতি নিভৃত সম্বোধনও। সোনপাহীর সঙ্গে কবিতার বিষয়ীর সম্বন্ধ চরিত্রগতভাবে রোমান্টিক প্রেমের। কিন্তু বিষয়ী প্রায়শ একজন আধুনিকতাবাদীর প্রতি সন্দেহপ্রবণ, সিনিকও (cynic)। তাঁর প্রেমের সম্বোধনকে আধুনিক জীবনের বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি ভারাক্রান্ত করে। কবিকে একইসঙ্গে তাই বলে নিরাশাবাদীও বলা যায় না। তাঁর রোমান্টিক দৃষ্টি আধুনিকতার স্বরূপ সন্ধান করেও সেখানে কল্পনার প্রার্থিত পরিপূর্ণতা খুঁজে পায় না। এই অভাব বিষয়ীর কল্পনা পূরণ করতে পারে না, বরং পরিহাসময় সমালোচনার মধ্য দিয়ে আধুনিকতার অনিশ্চয়তা, বিচ্ছিন্নতাবোধকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। কবি নিজস্ব উপলব্ধিকে বিষয়ীর প্রতি নিক্ষেপ করার পর যেন একজন পর্যবেক্ষক হয়ে পড়েন এবং তাঁর কবিতার বেশিরভাগ অভিব্যক্তিই এই পর্যবেক্ষকের উচ্চারণের মতো। তিনি 'স্বপ্ন দেখার জিলমিল

জিলিকণি পার হৈ' (স্বপ্ন দেখার ঝলমলে দ্যুতি পার হয়ে) যে 'চহরর প্রাণকেন্দ্র' (শহরের প্রাণকেন্দ্র)-এর দিকে ধাবিত হন সেখানে 'সন্ধিয়া বাটর ভীর, সিনেমার গান কাণত বাজে, পাণ দোকানত হাঁহির তীক্ষ্ণ ধার' (সন্ধের রাস্তার ভিড়, সিনেমার গান কানে বাজে, পানদোকানে হাসির তীক্ষ্ণতা)। এখানে 'নিয়তির স'তে চির সংগ্রামত' (নিয়তির সাথে চিরসংগ্রামে) রত দুর্বল মানুষের 'ক্ষণিকর (ক্ষণিকের) ভয়'-এর মধ্য দিয়ে 'জীয়াই থকার আশা' (বেঁচে থাকার আশা) অনিশ্চয়তায় বন্দি হয়ে থাকে।

এইসব কবির বাইরে বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে 'রামধেনু'-র মাধ্যমে বেশ কয়েকজন কবি 'আধুনিক' কবিতার চর্চায় রত ছিলেন। এঁদের অধিকাংশই আধুনিকতার মর্ম উপলব্ধি করতে না-পারায় কাব্যজগতে স্থান লাভে অসমর্থ হন। তরুণ বয়সে সমালোচক হীরেন গোহাঁই সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "...অস্বীকার করে লাভ নেই, নিকটবর্তী বঙ্গদেশের আধুনিক কবিতার অবুঝ নকল আধুনিক কবিতার জন্মরহস্য।" কিন্তু তাই বলে তিনি আধুনিকতাবাদী কবিদের নিরুৎসাহও করেননি। 'অর্থ ও অনর্থ— আধুনিক অসমিয়া কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন যে "অসমিয়া সাহিত্যের আঙ্গিকে 'অভিনব অবদান' এত বেশি সংখ্যক হতে পারে যে আধুনিক অসমিয়া কবিরা ইচ্ছে করলে অসমিয়া কাব্যকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।" পরবর্তীকালে, বিশেষত ষাটের দশকে ক্ষুরধার সমালোচক (যখন তিনি বয়সে পরিণত) ড. হীরেন গোহাঁই আধুনিক সমালোচনার পথপ্রদর্শক হিসাবে আধুনিক কবিতার দুর্বলতা ও সম্ভাবনার দিকগুলি তুলে ধরে তার বিশৃঙ্খলাদি দূর করতে এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং নিজেও এক ধরনের নতুন ধারার পরিহাসময় ব্যঙ্গকবিতার সৃষ্টি করে আধুনিকতায় আলোকপাত করেছিলেন। ষাটের দশকের আর-একজন সমালোচক ভবেন বরুয়া আমেরিকার নতুন সমালোচনার আদলে কবিতার নিবিড় পাঠ তুলে ধরেছিলেন এবং অসমিয়া কবিদের নতুন রীতিতে ব্যবহৃত পরস্পরবিরোধী উক্তি (বিরোধাভাস নয়), ভাষার বিভ্রান্তি, চিন্তার শিথিলতা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁদের এই সমালোচনার ফলে আধুনিক অসমিয়া কবিতায় যে-সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল তা দূর হয়ে ভাষার ব্যবহারও শক্তপোক্ত হতে শুরু করে এবং সেইসঙ্গে পর্যবেক্ষণে স্পষ্টতা প্রকাশ পায়।

ভবেন বরুয়া নিজেও এই যুগের এক প্রধান কবি। ফরাসি কবি মালার্মের আদর্শের প্রতীকবাদকে তিনিই সম্ভবত ভালো করে আয়ত্ত করেন। অসমিয়া কবিতায় ভবেন বরুয়ার কবিতাকে প্রতীকবাদী কবিতার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাঁর কবিতার কাব্যকৌশলে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'শুভ্রতার স্বর' শিরোনামে তাঁর একটি কবিতায় 'শুভ্রতা'— এক গুণবাচক বিশেষ্য— শুভ্র রঙের বিমূর্ত অবস্থা, তথাপি এর সম্পর্ক দৃষ্টির সঙ্গেই বলে সাধারণ মানুষ মনে করবেন। আবার দৃষ্টির কারণে শুভ্র রং সমস্ত রঙের সমাহার। আমাদের বোধে সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতিই পরস্পরের মধ্যে রূপান্তরিত হতে পারে, সে-কারণেই রাগের ছবি আমরা কল্পনা করতে পারি এবং সেইসঙ্গে ছবির নৃত্যও। সচরাচর অনুভূতির ভিতরে অনুপস্থিত অন্তরানুভূতির প্রক্ষেপ 'শুভ্রতার স্বর' সমাহারে প্রতীকী হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অসমিয়া আধুনিক কবিতার কাব্যকৌশলে বিগত শতকের ষাটের দশকের পরবর্তী পর্বে চিত্রকল্পবাদী রীতির বিশেষ প্রভাব পড়লেও ভবেন বরুয়ার কবিতায় প্রতীকবাদের প্রভাবই অধিক। নীলমণি ফুকনের উল্লিখিত কবিতার প্রথমভাগ এবং ভবেন বরুয়ার কবিতার প্রথমভাগ তুলনা করে দেখলে প্রধানত এটাই চোখে পড়ে। তাঁর 'ধুমুহার প্রান্তত' (ঝড়ের প্রান্তে) কবিতায় 'মৌন' শব্দটি একটি বিশেষণ। কিন্তু কবিতাটিতে ওই শব্দ বিশেষ্যের ভূমিকায় উপস্থিত এবং এক মানসিক অবস্থার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে যেখানে মন যেন 'শুনি রয় নিজরে মৌন'-কে (শুনতে থাকে নিজেরেই মৌনকে)। মৌনকে শোনার কথায় বিরোধাভাস রয়েছে। মনের এক অবস্থাকে প্রকাশ করতে অভিধা বা সংজ্ঞাকে অতিক্রম করে প্রতীকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এই 'মৌন' যেন storm before a calm (ইংরেজিতে calm শব্দটি বিশেষণ ও বিশেষ্যও)। যেন সৃষ্টিশীল মনের শান্ত এক অবস্থাতে সংঘটিত এক quickening। শেষ সারিতে আবার সেটাই দুর্বার হয়ে মৌনী ঝঞ্ঝায় পরিণত হয়। মৌন শব্দটি বিশেষ্যে বিমূর্ত হয়ে শেষে বিশেষণের ভূমিকা নিয়ে এক দুর্বার প্রকাশে সজীব হয়ে ওঠে।

পঞ্চাশের দশকে আধুনিক কবিতা চর্চায় নিবেদিত অপর দুই কবির নাম আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাইছি। এঁদের একজন প্রফুল্ল ভূঞা এবং অন্যজন মহিম বরা। প্রফুল্ল ভূঞা খুব বেশি সংখ্যক কবিতা লেখেননি। তাঁর কবিতায় ভাবের পরিচ্ছন্নতা লক্ষিত হয়। যে-সময়ে অনেক তরুণ কবি বিভ্রান্তিকর ভাষা

ব্যবহার করছিলেন সেই সময়ে তিনি পরিমিতিবোধের শব্দ চয়ন করেছেন এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বিহু নামক একটি কবিতায় নগরমুখী আধুনিক মন লোকজীবনকে যেভাবে পুনরাবিষ্কার করে তার সংবেদনশীল অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। মহিম বরার বৈষ্ণব সাহিত্যে মজ্জিত মনে আধুনিকতার স্পর্শ লাগায় পুরাণের কল্পনা আধুনিক মোচড় (twist) নিয়ে নতুন অর্থের ভিতর দিয়ে দীপ্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর 'মাছ' কবিতার মাছের কাল্পনিক উৎস হল 'মৎস রূপে অবতার হৈলা প্রথমত'— শংকরদেবের দশাবতার থেকে মনে গ্রথিত এক চিত্রকল্প। কিন্তু নিজের কবিতায় এটি প্রতীক হয়ে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়েছে এবং মৃত্যুকে অতিক্রমকারী দুর্বার জীবন প্রবাহের ইঙ্গিত দিয়েছে। 'পুখুরী' (পুকুর) কবিতার সাঁওতালি নাচ লোকজীবনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে আহরিত চিত্রকল্প। শাম্ব পুরাণ-কাহিনির চরিত্র, কিন্তু সেখানে আধুনিক মনের অনিশ্চয়তা প্রকাশ পেয়েছে, কারণ 'জীবনর স্তরে স্তরে পোয়া কয়লার খাদ' এবং 'নতুন মৃত্যুর গোন্ধ প্রতি উষাহত' (নতুন মৃত্যুর গন্ধ প্রতিটি উষায়)। কিন্তু বিষয়ীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও সংস্কৃতি-সৃষ্ট সৌন্দর্য প্রতীক হিসাবেও ধরা পড়েছে। যেমন, 'বরষুণর শেষত শ্যামল উজ্জ্বল পুখুরীর পার, চাওতালী নাচ' (বর্ষণের শেষে শ্যামল উজ্জ্বল পুকুরের পার, সাঁওতালি নাচ) ইত্যাদি। কানায় কানায় পরিপূর্ণ পুকুর অন্যদিকে গর্ভবতী নারীরও প্রতীক। গর্ভবতী পৃথিবীর অভিশপ্ত শাম্বকে গর্ভে ধারণ করার অনুভবের যে-আশঙ্কা তার এক বিকল্প পৃথিবীর কাছ থেকে বিষয়ী আশা করেছে— 'সেয়েহে ব্যাকুল আমি/বাট চাই তোমার উত্তর/চিকুন শ্যামল এটি তোমার উত্তর।' (সেজন্যই আমরা তোমার উত্তরের পথ চেয়ে ব্যাকুল, তোমার একটি মসৃণ শ্যামল উত্তর।)

ষাটের দশকে এক অধ্যয়নপুষ্ট মন নিয়ে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অসমিয়া কাব্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন এবং আধুনিকতাবাদী রীতি অনুসরণ করে আয়ত্তও করেছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আধুনিকতাবাদী কবিদের মধ্যে প্রতীকবাদ ও চিত্রকল্পবাদের বেশি প্রভাব পড়েছিল সে-সময়ে। ফলে যে-বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছিল তা হল শব্দ-সচেতনতা। শব্দের গীতিময় ও চিত্রময় সম্ভাবনাকে একেকজন কবি তাঁদের কাব্যকৌশলে ব্যবহার করেছিলেন। সেই পথে না-গিয়ে কবি হীরেন্দ্রনাথ যে-পথটি বেছে নিলেন সেখানে মনের এক উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। তিনি ব্যবহার করতে শুরু করলেন ইংরেজি মেটাফিজিক্যাল কবিতায় প্রাপ্ত 'উইট'-এর উৎপ্রেক্ষাধর্মী ব্যবহার। স্যামুয়েল জনসন এ-ধরনের কাব্যালংকারকে ভিন্নধর্মী চিন্তার জবরদস্ত সংযোজন বলে ভর্ৎসনা করেছিলেন। কিন্তু উইট-এর অভিনব ইঙ্গিতধর্মী বৌদ্ধিক শক্তি এলিয়ট ও ক্লিয়ান্থ ব্রুক্স দেখিয়েছিলেন এবং এলিয়ট নিজে ব্যবহার করেছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ হুজুগের বশবর্তী হয়ে এই কাব্যকৌশলের আশ্রয় নেননি। প্রথম বয়সের নিসর্গ-প্রধান জীবনক্ষেত্রের আঞ্চলিক ভাষায় সমৃদ্ধ নিজস্ব প্রকাশভঙ্গির (idiomatic) শব্দসম্ভার ও পরবর্তী জীবনের বৌদ্ধিক পরিক্রমার ভিতরে আহৃত বুদ্ধিদীপ্ত মিশ্রণ তাঁর কাব্যকৌশলে পাওয়া যায়। তাঁর 'অস্তাচল' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এ-রকম : "নিলগত ঘরে ঘরে শেয়ালি ফুলর দরে/শোঅনি পাটিত সিঁচি রিমজিম স্বাদর কুঁঅলী/মালিনী রাতিয়ে ঢালে বিরতির মাদকতা তাতে/মোর হলে অন্তহীন এই পথারত/স্মৃতির জোনাকীবোরে/কাবুলিআলার দরে/ঘুরি ঘুরি চক্রবৃদ্ধি লোটে।" (দূরে ঘরে ঘরে শেফালি ফুলের মতো/বিছানার পাটিতে রিমঝিম স্বাদের কুয়াশা ছিটিয়ে/মালিনী রাত যেন ঢালে বিরতির মাদকতা তাতে/আমার হলে এই অন্তহীন মাঠে/স্মৃতির জোনাকিদল কাবুলিঅলার মতো/ঘুরে ঘুরে চক্রবৃদ্ধি লোটে।) এই কবিতায় ধ্বনির অনুপ্রাসে ব্যঞ্জনাও ফুটে ওঠে (যেমন শ-শ-স-স্ব; র-র-র-র-র-র এবং ম-ম-ম-স্ম ইত্যাদির অনুপ্রাস)। কিন্তু এখানে 'রিমজিম স্বাদর কুঁঅলী' 'মালিনী রাতি'-তে ঢেলে দেওয়া 'বিরতির মাদকতা' এবং অন্যদিকে কাবুলিঅলার মতো 'স্মৃতির জোনাকী'গুলো 'চক্রবৃদ্ধি' হারে সুদেমূলে আদায় করার বিরক্তি। এখানেও আমরা এক চিত্রকল্প পাই, কিন্তু সেটা বুদ্ধিদীপ্ত উইটের ইঙ্গিতধর্মী সংমিশ্রণে সৃষ্ট বৌদ্ধিক তাৎপর্যের ভিতর দিয়ে এসেছে। এখানে এক সমালোচনাধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে আধুনিকতার মর্মে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন কবি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

এবার উল্লেখ করা যেতে পারে একজন প্রথম দিককার আধুনিকতাবাদী কবির কাব্যিক প্রয়াসের কথা। মহেন্দ্র বরা ছিলেন আধুনিকতাবাদী কবিতার একজন ঘোরতর সমর্থক বা প্রবক্তা। তিনি এই ধারার কবিতার বিরোধী সমালোচকদের প্রত্যুত্তর দেওয়ার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিলেন। বয়সে নবকান্ত বরুয়ার চেয়ে তিনি বছর তিনেকের ছোট হলেও কবি হিসাবে সমসাময়িক। নবকান্তের স্তর স্পর্শ করতে না-পারলেও আধুনিকতাবাদী কবিতাকে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য

তিনি যথেষ্ট প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তাঁর এই অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারার কবিতার প্রথম সংকলন 'নতুন কবিতা'-র সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

আধুনিকতাবাদী সব কবির কবিতাতেই যে ব্যক্তিমনে নিমজ্জিত অনুভূতির আলোড়নের প্রকাশ ছিল তেমন নয়। প্রগতিবাদী কবিতার বামপন্থী চিন্তার মধ্য দিয়ে আধুনিক সময়ের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন কয়েকজন কবি। এঁদের মধ্যে সার্থক কবি হলেন রবীন্দ্র সরকার। সত্তরের দশকে কবিতা লেখার সূত্রপাত তাঁর। সেই সূত্রে তিনি নিজেকে 'সত্তরর (সত্তরের) পদাতিক' বলে ঘোষণা করেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে সর্বহারার জীবন, তাই বলে তিনি প্রকৃতিকেও ভুলে থাকতে পারেন না। 'নরকত বসন্ত' (নরকে বসন্ত) কবিতায় তেমন এক সর্বহারার জীবন প্রকৃতির সৌন্দর্যের পরিপ্রেক্ষিতে কবি বিচার করেছেন এবং সেখানে ফুটে উঠেছে পরিহাসময় করুণা— ''ডাস্টবিনত রঙা লাউর স্থূলতাত/নাগরিক যন্ত্রণাই চক খায়.../তথাপি বহাগ আহে।/কৃষ্ণচূড়া রঙে রঙে আরু রঙা হয়/বাটর কাষর নঙঠা লরাটোয়ে/লঘোনে মাকজনী মরার পিছত/বাছ স্টপত থিয় হৈ/রৈ রৈ সুহুরি দি কুলির মাত মাতে/আঃ নরকত এতিয়া বসন্ত।'' (ডাস্টবিনে মিষ্টিকুমড়োর স্থূলতায়/নাগরিক যন্ত্রণা ঘুরপাক খায়.../তবুও বৈশাখ আসে।/কৃষ্ণচূড়া রঙে রঙে আরও লাল হয়/রাস্তার ধারে ন্যাংটো ছেলেটা/উপোসে মায়ের মৃত্যুর পর/বাস স্টপে দাঁড়িয়ে/মাঝে মাঝে শিস দিয়ে কোকিলের ডাক ডাকে/আঃ নরকে এখন বসন্ত।)

আগেই উল্লেখ করেছি যে আধুনিকতাবাদী অসমিয়া কবিতায় চিত্রকল্পবাদ ও প্রতীকবাদের প্রভাব পড়েছিল যথেষ্ট। তবু তারই মধ্যে একজন কবি ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি কবীন ফুকন। তাঁর কবিতায় ভাষার বৈশিষ্ট্য অন্য সব আধুনিকতাবাদী কবির থেকে পৃথক। আধুনিকতাবাদীরা নতুন এক কাব্যিক ভাষা তৈরি করার জন্য রোমান্টিক কবিদের ব্যবহৃত বহু শব্দ পরিহার করেছিলেন, কারণ তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে বহু ব্যবহারের ফলে এই শব্দগুলি ভাবনার ব্যঞ্জনাময় প্রকাশের ক্ষেত্রে নির্জীব হয়ে পড়েছিল। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বহু বিষয়বস্তুকে তাঁরা এড়িয়ে চলতেন কিংবা নতুন প্রসঙ্গের মাধ্যমে ওই ধরনের শব্দের চেহারা পালটে অন্য ধরনের (অচেনা) করে নিতেন। কিন্তু কবীন ফুকন দেখালেন যে এ-রকম বহু নির্জীব ধরনের শব্দ উপযুক্ত চয়নে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠতে পারে এবং সেটার আদল পালটে (অচেনা শব্দ) ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। নবকান্ত বরুয়া তাঁর 'সন্ধ্যার রেপ'চডি' কবিতায় ব্যঙ্গ পরিহাসের সুর এনে অসমিয়া মনে 'জোন' (চাঁদ)-এর অতি পরিচিত রূপ ভেঙে দিয়ে নতুন প্রসঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাকে রোমান্টিক আবেশ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কবীন ফুকন 'তোক দেখি ন জোনে' নামক কবিতায় সচেতনভাবে এর বিপরীতে গিয়ে 'জোন'-কে রোমান্টিকের অভ্যস্ত সমাধানেই ফিরিয়ে এনেছেন, কিন্তু আধুনিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে প্রশ্নের স্থানে রাখা হয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধের লেখক তাঁর কবিজীবন শুরু করেন প্রতীকবাদের প্রভাবের মধ্য দিয়ে। তাঁর 'সমুদ্রভীতি' কবিতায় 'সাগর' হল কালের প্রতীক, যে 'কাল'-এর পার দেখা যায় না অর্থাৎ এক অনন্তকাল এবং যে-কাল সৃষ্টিশীল। কিন্তু কালের অন্য একটি রূপও আছে, ইতিহাসের কাল, যার প্রতীক এই কবিতায় 'সিন্ধু'। একটি প্রবহমান 'নদী', কিন্তু যার অন্ত পড়ে সাগরে অর্থাৎ অনন্তকাল বা মহাকালে গিয়ে। নিজের সৃষ্টিকার্যের বিনাশের সম্ভাবনা কবিকে ভীতিগ্রস্ত করেছে, কিন্তু অনন্তকালের সৃষ্টিশীলতা তাঁকে এই ভীতি থেকে মুক্তও করেছে। পরবর্তী সময়ের কবিতায় কবি প্রতীকবাদের প্রভাব থেকে সরে এসেছেন এবং অভিজ্ঞতার রূপকের সন্ধান করেছেন। তাঁর পরের দিককার কবিতায় চিত্রকল্প ও বর্ণনার ওতপ্রোত সংযোগ ঘটেছে।

এর পরবর্তী কবিরা হলেন 'তরুণ প্রজন্ম', স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে জন্মগ্রহণকারী কবিরা। এঁদের মধ্যে আনিচ-উজ-জামান এবং তরুণ বরুয়ার কবিতায় চিত্রকল্পবাদের প্রভাব রয়েছে। আনিচ-উজ-জামান নৈর্ব্যক্তিকতাকে অনুকরণ করা ছেড়ে দিয়ে পরে ব্যক্তিত্ব প্রকাশে গুরুত্ব দেন। কিন্তু তাঁর কবিতা নতুন স্তরে উপনীত হতে সক্ষম হয়নি। তথাপি তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রথম সারির কবি। অন্যদিকে তরুণ বরুয়া সম্ভাবনাময় কবি হলেও পরের দিকে যেন প্রায় থেমে গেলেন। পরবর্তী সময়ে যাঁরা ক্রমান্বয়ে উঠে এসেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রফিকুল হুসেইন, সমীর তাঁতী, সনন্ত তাঁতী, নীলিম কুমার, অনুভব তুলসী, বিপুলজ্যোতি শইকীয়া, জীবন নরহ, মনোজ বরপূজারী, রাজীব বরুয়া, সৌরভ শইকীয়া, প্রয়াগ শইকীয়া প্রমুখ। এঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় এবং প্রতিভাধর। তবে এঁদের চেয়ে তরুণতর কবিদের মধ্যে কমলকুমার তাঁতী, বিজয়শংকর বর্মন এবং প্রণবকুমার বর্মনের নাম উল্লেখযোগ্য। মঞ্চসুলভ তরল

জনপ্রিয়তার প্রতি আকর্ষণ পরিত্যাগ করতে পারলে প্রণবকুমার বর্মনের সম্ভাবনা অন্য দুজনের চেয়ে বেশি। চপলতা তাঁর অনেক কবিতার সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়।

দ্ব্যর্থকতা (ambiguity), বিরোধাভাস (paradox) আধুনিকতাবাদী কবির পরিহাসময় দৃষ্টিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁদের কবিতায় প্রত্যয়ের চেয়ে অনিশ্চয়তা, স্বস্তির চেয়ে শঙ্কা, আস্থার চেয়ে প্রশ্ন এবং আবেগের চেয়ে নির্লিপ্তি বেশি। এই ধারা কতদিন স্থায়ী হবে তা বলা মুশকিল। কারণ, অতি সাম্প্রতিক কবিতায় রোমান্টিক আবেগের প্রকাশ যেন ফিরে এসেছে বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তার পাশাপাশি দৃষ্টির অক্ষরেখাও সংকীর্ণ বা ছোট হয়ে ফুটে উঠেছে। আগেকার যুগের রোমান্টিক কবিদের দিগন্তব্যাপী প্রসারিত যে-দৃষ্টি লক্ষ করা গিয়েছিল তার সন্ধান এই প্রজন্মের কবিদের কবিতায় মেলে না। ❑

রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

আধুনিক বাংলা কবিতার বিবর্তন

তরুণ মুখোপাধ্যায়

জীবন যেমন, কবিতাও তেমনি অন্তহীন, মৃত্যুহীন। অন্তত মানুষ ও মানবসভ্যতা যতদিন থাকবে, কবিতাও থাকবে। তাই বাংলা কবিতার বয়স হাজার বছর পার হলেও সে নিত্যনবীনা, রসময়ী, রহস্যময়ী। যথার্থ কবি ও সহৃদয় পাঠক-প্রেমিক ছাড়া তাকে ধরা যায় না। পেয়েও মনে হয় পাওয়া হল না। নারীর মতোই কবিতা স্পর্শপ্রিয়, আদরপ্রিয়। তার জন্য যে কষ্ট ভোগ করে, রক্ত ও অশ্রুপাত করে, তারই কাছে আসে কবিতা। তখন বুদ্ধদেব বসুর মতো বলতে হয় 'কবিতাই প্রেম'। কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলা যায়— 'শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম।'

বাংলা কবিতার বিবর্তনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, আদি-মধ্য যুগের কবিতা মুখ্যত ছিল দেবতা, ধর্ম, আচার-আশ্রয়ী। 'রিচুয়াল' শব্দটি এ-ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। চর্যাপদ থেকে মঙ্গলকাব্য— নবম-দশক শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি। তবে এ-কথাও সত্য, কবিরা কেবল আকাশচারী ছিলেন না, মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে পা-ও ফেলেছেন। তাই রক্তমাংসের মানুষের চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না, ক্রোধ-ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তাঁদের কবিতায়। আধুনিক কালে বাংলা কবিতার যে-সব ধারা দেখা যায়, মোটা দাগে তাকে প্রেমের কবিতা, রোমান্টিক কবিতা, ধ্রুপদী ভাবভঙ্গির কবিতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার কবিতা, অন্তর্মুখী কবিতা ইত্যাদি নানা অভিধা দেওয়া যায়। নিজের সম্পর্কে সমালোচকদের দেওয়া অভিধা নিয়ে ক্ষুব্ধ জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, তাঁর কবিতা অবিমিশ্রভাবে নির্জনতার বা নিশ্চেতনার কবিতা মাত্র নয়। তবু আলোচনার সুবিধার্থে আমরা কবিতার এই বিভাজন মেনে নিই।

যদি সূত্রাকারে বাংলা কবিতার বিবর্তন বা বাঁকবদল দেখাতে চাই তো বলতে হয়, আদি ও মধ্য যুগের কাব্যে দুটি ধারা সর্বদা বহমান ছিল— ধর্মাশ্রিত ও মানবাশ্রিত ধারা। আধুনিক কাব্যে ঈশ্বর গুপ্ত নিয়ে এলেন রিয়ালিস্ট কাব্যধারা। মধুসূদন দত্তের কাব্যে এল ক্লাসিসিজ্‌ম ও রোমান্টিকতা এবং ব্যক্তিহৃদয়ের প্রকাশ। বিহারীলাল চক্রবর্তী লিরিক কবির বাসনা-বেদনা যথাযথ ভাবে উন্মোচন করলেন। আর রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার রাজাধিরাজ— বর্ণময়, বৈচিত্র্যময় করলেন বাংলা কবিতা। যদিও তিনি ভাববাদী কবি। রবীন্দ্রোত্তর কবিকুল অতিরিক্ত বাস্তবতার নামে নিয়ে এলেন যৌনতা, কুশ্রীতা, অসুন্দরের নতুন ব্যাখ্যা। আঙ্গিকে ঘটল নানা পরিবর্তন। গদ্যকবিতা শুধু নয়, ছন্দের ভাঙাচোরা রূপ, স্তবকবিন্যাসে নিয়মলঙ্ঘন, শব্দ ও ভাষা প্রয়োগে বিপুল স্বাধীনতা তাঁরা নিলেন। তিরিশ থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত চলেছে এরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই একুশ শতকও সেই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। খানিকটা old wine in a new bottle ধরনে। যদিও কবিদের সৌন্দর্য-সাধনা, রূপারতির ঐতিহ্য ম্লান হয়নি। চর্যাপদে শবর শবরীর রূপে উন্মাদ। আর বৈষ্ণব কবি বলেন, 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর/প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর'— তখন তা নিখিল নরনারীর আকুলতা হয়ে ওঠে। অবশ্য প্রাচীন বা মধ্য যুগ ব্যক্তি-কবির

যুগ। বৈষ্ণব কবিরা গোষ্ঠীচেতনাকে ধর্মীয় আশ্রয়ে ব্যক্ত করলেও কবিতার সঙ্গে তার যোগ নেই। চণ্ডীদাস কিংবা বিদ্যাপতি আপন মানসীর জন্যই বিরহমিলনগাথা রচনা করেছেন।

উনিশ শতকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে বঙ্গদেশে নবজাগরণ সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতায় সুদূরপ্রসারী ছাপ ফেলেছিল। পয়ার-পাঁচালির নরম নিবিড় ছন্দে কবিতা লেখার কাল আর নেই, প্রথম বুঝেছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিটন সোসাইটি হলে বক্তৃতায় বলেছিলেন, ইংলন্ডীয় প্রথায় কবিতা লেখা ছাড়া বাংলা কবিতার মুক্তি অসম্ভব। নিজে তিনি পারেননি; পথ নির্দেশ করেছিলেন। মধুসূদন দত্ত সেই কবিপুরুষ যিনি দেশ-বিদেশের সাহিত্যফুলের মধু সংগ্রহ করে রচনা করেছিলেন 'মধুচক্র'— গৌড়জন যার আস্বাদে তৃপ্ত হয়েছিল। শুধু বিষয় ও বক্তব্য নয়, ছন্দে মধুসূদন যে-ভাঙাগড়ার কাজ করলেন, যে-অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করলেন তা পরবর্তীকালের বাংলা কবিতার সীমা প্রসারিত করে দিল। ছন্দ যে কবিতার প্রাণস্পন্দন সেটা কবিরা বুঝতে পারলেন। শুরু হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পার হয়ে এই বিশ শতকের আশি-নব্বইয়ের দশকের কবিরা পর্যন্ত ছন্দের যে-কারুকার্য দেখিয়েছেন তার জন্য মধুসূদনের কাছে বাংলা কবিতা ঋণী।

কবিতা কবির জন্য, না কি পাঠকের জন্য— এই বিতর্ক বহুদিনের। বিহারীলাল চক্রবর্তী যখন আপনমনে, আপন সুরে কবিতা লিখলেন, রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল এই কবিতা নিভৃতে কান পেতে শোনার জন্য। স্বয়ং কবি ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর অনুভূতি ও মানসীকে "কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারি নে।" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বা মধুসূদন দত্ত প্রমুখ কবি চেয়েছিলেন কবিতা সর্বজনগ্রাহ্য হোক। রবীন্দ্রনাথ 'গৃহের বনিতা'-কে 'বিশ্বের কবিতা' করে তোলার অঙ্গীকারে লিখেছিলেন,

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—

যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বরসাধনায় 'ফাঁক' রয়ে গেছে বলে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন,

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

উত্তর-রবীন্দ্রযুগের কবিরা এই রন্ধ্রপথে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

কোনো একটি পত্রিকা যে কবিতাকে আন্দোলনের আশ্রয়ভূমি করতে পারে তার দৃষ্টান্ত 'কল্লোল' পত্রিকা। দীনেশচন্দ্র দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগের সম্পাদনায় ১৯২৩-এ যার আত্মপ্রকাশ। অবশ্য এর আগে প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সবুজ পত্র' পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা গদ্যরীতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন ১৯১৬-তে। ছোট পত্রিকা অর্থাৎ লিট্‌ল ম্যাগাজিন যে সাহিত্য-আন্দোলনের হাতিয়ার তা সেই প্রথম লেখক ও পাঠকেরা টের পেয়েছিলেন। রাবীন্দ্রিক ঘরানাকে অস্বীকার করে বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত সঞ্চালনের দায়িত্ব নিয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকা। বাস্তবতা ও যৌনতা এবং সমাজের ইতর শ্রেণির মানুষের কথা বলার মুখপত্র হয়েছিল 'কল্লোল'। রবীন্দ্রপন্থা পরিত্যাগই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। যার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি' (১৯২৭) পত্রিকা। নবীন প্রতিভা সন্ধানই ছিল লক্ষ্য। 'সবুজ পত্র' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও একসময় প্রমথ চৌধুরীকে এই পরামর্শই দিয়েছিলেন—

লেখা সৃষ্টির চেয়ে লেখক সৃষ্টির বেশি দরকার।... নবীন লেখকেরা সবুজ পত্রের আদর্শকে ভয় পায়— তাদের একটু অভয় দিয়ে দলে টেনে নিয়ো, ক্রমে তাদের বিকাশ হবে।

বাংলা সাহিত্যপত্রিকা জগতে অভিনব, অভিজাত ও মননশীল পত্রিকারূপে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার নাম (প্রথম প্রকাশ ১৯৩১) অবশ্য উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানের পরিচয় দেওয়া। এ-ছাড়াও সেখানে প্রকাশিত হত ভালো গ্রন্থ-সমালোচনা, প্রগতিবাদী, যুক্তিবাদী প্রবন্ধ এবং দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস বিষয়ক নানা রচনা। এই পত্রিকাটিকে অনেকে ইংরেজি ডি-ক্রাইটেরিয়ান পত্রিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

শুধু কবিতার জন্য উৎসর্গীকৃত পত্রিকা 'কবিতা'। প্রথমে বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র যুগ্ম সম্পাদক হলেও পরে একা বুদ্ধদেব বসু এর প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন। ১ অক্টোবর ১৯৩৫-এ 'কবিতা' পত্রিকার জন্ম। যা হয়ে উঠেছিল সেই সময়ের তরুণ কবিদের আঁতুড়ঘর। কবি অরুণকুমার সরকারের স্মৃতিচারণে জানা যায়,

কবিতা ভবনে দু'ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে আসা মানে হাওয়া বদল করে আসা, উদ্দীপ্ত হওয়া, কবিতা লেখার প্রেরণা পাওয়া।

'কবিতা' পত্রিকার সঙ্গে যে-কোনো কারণেই হোক মন কষাকষির ফলে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রকাশ করলেন (সঞ্জয় ভট্টাচার্যের

সহযোগিতায়) 'নিরুক্ত' পত্রিকা (১৯৪০)। পত্রপত্রিকায় যাঁরা কবিতা ছাপানো অবহেলার কাজ মনে করতেন, 'কবিতা' পত্রিকা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছিল। 'স্বল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত পাঠকের কাছে' কবিতা পৌঁছবে, এটাই ছিল প্রত্যাশা। আর 'নিরুক্ত' চেয়েছিল, এলিয়টীয় দুর্বোধ্যতার অনুসরণে বাংলা সাহিত্যের একদল 'বুদ্ধিজীবী' কবির বাংলা কবিতাকে 'অস্পৃশ্য' করে তোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে।

কবিদের ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনা ও অনুভব প্রকাশের জন্য যে-সব পত্রিকা বিশ শতকের তিন বা চারের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি ছিল প্রধানত কলাকৈবল্যবাদী। চল্লিশ বা চারের দশকে 'অরণি' (১৯৪১) পত্রিকা সমাজমনস্কতা ও রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় বহন করেছিল। বাংলা প্রগতি-সাহিত্যের হোমানল এখানেই জ্বলেছিল। এই সেই পত্রিকা যেখানে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের ধারাবাহিক প্রকাশ ঘটে। ১৯৪৮-এ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য সেই উত্তরাধিকার বহন করে 'অগ্রণী' (১৯৪৮) পত্রিকা। এখানে তরুণ সাহিত্যিকরা লিখতেন। দুটি পত্রিকাই প্রগতিবাদী সাহিত্য আন্দোলনের ভূমিকা পালন করেছিল। সেখানে কবি ও লেখকেরা ছিলেন গোলাম কুদ্দুস, রাম বসু, বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুধী প্রধান প্রমুখ। এই ধারার উত্তরাধিকার পরে বহন করেছিল 'কবিতা সীমান্ত' পত্রিকা ও তার কবিগোষ্ঠী।

তিরিশের কবিরা ভাব-ভাষা-ভঙ্গিতে চেয়েছিলেন অ-রাবীন্দ্রিক হতে। যে-জন্য তাঁরা বিদেশী কবিদের দ্বারস্থ হন। লরেন্স, হুইটম্যান, বোদলেয়ার, এলিয়ট, ইয়েট্‌স প্রমুখ কবিরা তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। চল্লিশের কবিরা রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে কৃষক আন্দোলন— তাঁদের স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিল, যেখানে 'কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া'। অবশ্য এই চল্লিশেই আমরা পেয়েছি স্বপ্নালু কবি অরুণ কুমার সরকার কিংবা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকেও। আছেন মণীন্দ্র রায়, যিনি দীর্ঘকবিতার এক ঐতিহ্য তৈরি করেছিলেন। অবশ্য পরে বাংলা কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যে-নতুন বাগ্‌ভঙ্গি ও আঙ্গিক এনেছিলেন তা পরবর্তী দশকের কবিদের অনুপ্রাণিত করেছে। কবিতায় গল্পের উপাদান কিংবা কাহিনির আভাস আনা, ঋজু গদ্যছন্দ প্রয়োগ, ঘরোয়া ও চেনা জীবনের ভগ্নাংশ চিত্রিত করার মধ্যে নীরেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব বোঝা যায়। তাঁর 'উলঙ্গ রাজা' কিংবা 'কলকাতার যীশু' প্রবাদপ্রতিম হয়ে আছে। আমার মনে হয়, সত্তরের কবি সুবোধ সরকার অগ্রজের এই উত্তরাধিকার তাঁর কবিতায় বহন করছেন (নিকানোর পারা-র কথা মনে রেখেও বলব)।

কবি ও কবিতা কখনো দেশ-কাল-সমাজ বিবিক্ত হতে পারে না। ঘটনাপ্রবাহ কবি ও কবিতাকে তীব্রভাবেই স্পর্শ করে। সুতরাং স্বাধীনতা লাভের কাল থেকে ২০০৭ পর্যন্ত যে-সব ঘটনা উল্লেখযোগ্য তার বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া বাঞ্ছনীয়, যার থেকে আমরা ধরে নিতে পারব, কবিরা কোন্ সময়ের অভিঘাতে চঞ্চল হয়েছেন এবং কবিতা কোন্ দিগ্‌দর্শন রচনা করেছে। আপাতত দশ বছরের ঘটনাপঞ্জি দেওয়া গেল।

১৯৪৬ — হায়দরাবাদে তেলেঙ্গানা আন্দোলন শুরু।
নৌ-বিদ্রোহ।
ছেচল্লিশের কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৬ আগস্ট)।

১৯৪৭ — দিনাজপুরের চিরির বন্দরে কৃষক মিছিলে গুলিচালনায় তেভাগা আন্দোলনের প্রসার।
ভারত ভাগ হল ১৪ আগস্ট; পাকিস্তান স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।
ভারতের স্বাধীনতা লাভ ১৫ আগস্ট।

১৯৪৮ — ৩০ জানুআরি আততায়ীর হাতে মহাত্মা গাঁধীর মৃত্যু।
অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি বলে ঘোষিত হল।
কাকদ্বীপ আন্দোলনে অহল্যা শহিদ হলেন।

১৯৪৯ — চিনে মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।
বাংলায় উদ্‌বাস্তুদের উপর গুলিচালনা।
রেল ধর্মঘট।

১৯৫০ — কোরিয়ায় যুদ্ধ শুরু।
২৬ জানুআরি ভারতের সংবিধান প্রকাশিত হল।
জাতীয় সংগীত রূপে গৃহীত হল বন্দেমাতরম ও জনগণমন অধিনায়ক।
বর্গাদার আইন প্রণয়ন ও পাশ।
শ্রীঅরবিন্দের জীবনাবসান।
সতীনাথ ভাদুড়ী 'জাগরী' উপন্যাসের জন্য প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন।

১৯৫১ — পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষা করার দাবি।
কোচবিহারে ভুখামিছিলে গুলি।

তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র আন্দোলনের সমাপ্তি, মৃত অসংখ্য কমিউনিস্ট।
ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ঘোষিত হল।
প্রকাশিত হল 'শতভিষা' কবিতাপত্র।

১৯৫২ — পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) মাতৃভাষা বাংলার জন্য আন্দোলন ও ছাত্রদের প্রাণদান।
বলিভিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হল।

১৯৫৩ — স্ট্যালিন মারা গেলেন।
তেনজিং নোরগে ও এডমন্ড হিলারি এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করলেন।
কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্‌বোধন হল।
ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বামপন্থীদের তীব্র আন্দোলন।
বার্নপুরে শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ ও সাত জনের মৃত্যু।
তরুণ কবিদের মুখপত্ররূপে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রকাশ।

১৯৫৪ — ১০ ফেব্রুআরি প্রথম শিক্ষক ধর্মঘট।
কবি জীবনানন্দের দুর্ঘটনায় মৃত্যু।

১৯৫৫ — ভারতবর্ষ জুড়ে শিল্প ধর্মঘটের প্রসার।
ভূমি সংস্কার বিল পেশ হল।
প্রথম সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার দেওয়া হল (মরণোত্তর) জীবনানন্দ দাশকে।

এখানে মাত্র দশ বছরের সালতামামি দিলাম, এ-জন্যই, প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব থেকে স্বাধীনতা লাভের পর বাকি আট বছর দেশ-কাল কেমন ছিল তার ধারণা দিতে। এই দশ বছরে যে-সব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তারও নির্বাচিত তালিকা দেওয়া যায়।

১৯৪৭ — বিষ্ণু দে : সন্দীপের চর
সুকান্ত ভট্টাচার্য : ছাড়পত্র
অজিত দত্ত : পুনর্নবা

১৯৪৮ — কৃষ্ণ ধর : অঙ্গীকার
জীবনানন্দ দাশ : সাতটি তারার তিমির
বুদ্ধদেব বসু : দ্রৌপদীর শাড়ি
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য কবিতা
সুভাষ মুখোপাধ্যায় : অগ্নিকোণ

১৯৫০ — অন্নদাশঙ্কর রায় : রাঙা ধানের খৈ
অসীম রায় : ফুটপাতে ফুলের গন্ধ
আলোক সরকার : উতল নির্জন
বিষ্ণু দে : অন্বিষ্ট
রাম বসু : তোমাকে
সুভাষ মুখোপাধ্যায় : চিরকুট

১৯৫৩ — অমিয় চক্রবর্তী : পারাপার
আনন্দ বাগচী : স্বগত সন্ধ্যা
গোলাম কুদ্দুস : ইলা মিত্র
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : সংবর্ত
বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত : আধুনিক বাংলা কবিতা

১৯৫৪ — অরবিন্দ গুহ : দক্ষিণ নায়ক
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : নীল নির্জন
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : উলুখড়ের কবিতা
রাম বসু : যখন যন্ত্রণা
সমর সেন : সমর সেনের কবিতা
গণেশ বসু : বনানীকে কবিতাগুচ্ছ

১৯৫৫ — অরুণ মিত্র : উৎসের দিকে
অমিয় চক্রবর্তী : পালাবদল
বুদ্ধদেব বসু : শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর
মণীন্দ্র রায় : কৃষ্ণচূড়া
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : প্রতিধ্বনি

১৯৫৬ — প্রেমেন্দ্র মিত্র : সাগর থেকে ফেরা
তরুণ সান্যাল : মাটির বেহালা
বিমলচন্দ্র ঘোষ : উদাত্ত ভারত
শঙ্খ ঘোষ : দিনগুলি রাতগুলি
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : লখিন্দর
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : দশমী

এই নির্বাচনও পাখির চোখে। কিন্তু এখান থেকে এটুকু ধারণা করতে পারি, কবিরা স্বাধীনতা-উত্তরকালে কাব্যবিষয়কে কত বিচিত্র ভাবে গ্রহণ করেছেন। যে-বিষয়ভাবনায় মিশে আছে ব্যক্তিক প্রেম, রোমান্স, রোমান্টিকতা, দূরাভিসার, সমাজ, আন্তর্জাতিক বোধও। সকলেই স্বভাবত স্বতন্ত্র। এঁরাই ষাট বছরের বাংলা কবিতায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। আরও এক দশকের

সালতামামি নিলে পাওয়া যাবে সেইসব কবিদেরও যাঁরা একদিন কলকাতা শাসন করেছেন মধ্যরাতে।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে দিনকাল, পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। যুদ্ধ, চক্রান্ত, মারণাস্ত্র ইত্যাকার কাণ্ডের সঙ্গে প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি বা অগ্রগতি ঘটেছে। যার প্রভাব পড়েছে সংবেদনশীল কবিদের লেখায়। সত্তর থেকে নব্বইয়ের দশকের কিছু ঘটনার উল্লেখ করা যায়। অবশ্য ষাটের দশকেই নকশাল আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল। সাহিত্যে শুরু হয়েছিল হাংরি আন্দোলন।

কবিতার মর্যাদা দেবার জন্য লড়াই শুরু করেছিল 'কবিতা' পত্রিকা (১৯৩৫)। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে বেশ কিছু সাহিত্যপত্রিকা কবিতার জন্য বেঁচে থাকার এক আশ্চর্য উন্মাদনা তৈরি করেছিল। আপাতশান্ত বাংলা কবিতার মন ও মেজাজের পক্ষে তা যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো মনে হয়েছিল পাঠক ও সমালোচকদের কাছে। প্রধানত পঞ্চাশ বা পাঁচের দশকেই এই ধরনের আন্দোলন ঘনীভূত হয়েছিল। 'শতভিষা' ও 'কৃত্তিবাস' এই দুটি পত্রিকা তারুণ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

১৯৫১-তে 'শতভিষা' পত্রিকা প্রথম প্রকাশ পায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যথাযথ ও রসোত্তীর্ণ কবিতা ছাপা হবে। কোনো ইজ্‌ম বা মতবাদলালিত কবিতায় এই পত্রিকার আস্থা ছিল না। সম্পাদক রূপে আলোক সরকার পরে বলেছিলেন, "আমরা কবিতাকে আবার কবিতার কাছে ফিরিয়ে আনব" এই ছিল 'শতভিষা'-র শর্ত। শতভিষা-র ৩৩ সংখ্যায় বলা হল—

তিরিশের কবিদের যৌনকাতরতা, মূল্যবোধে অনাস্থা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অতিরিক্ত সমাজভাবনা, তরল কাব্যময়তা ইত্যাদি আপাত লক্ষণগুলি যে আর ব্যবহৃত হবার নয়, এ সত্য অভ্রান্ত জেনে বাংলা কবিতার মুক্তির জন্য 'শতভিষা' প্রয়োজন অনুভব করেছিল নতুন পথ সন্ধানের।

পঞ্চাশের প্রায় সমস্ত কবিকেই আমরা শতভিষা-র পাতায় পাতায় দেখি। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, তারাপদ রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার প্রমুখ উল্লেখ্য। ষাটের কবিরাও এখানে লিখেছেন। যেমন, সামসুল হক, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, পুষ্কর দাশগুপ্ত, পরেশ মণ্ডল, রাণা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্যও এখানে কবিতা লিখেছেন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে কবিতার কাগজ 'শতভিষা' হয়ে উঠেছিল কবিদের মুখপত্র।

উত্তর-তিরিশ তথা উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে লেখা কবিতাগুলি কেমন ছিল তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

১. *প্রভু, যদি বলো, অমুক রাজার সাথে লড়াই*
কোনো দ্বিরুক্তি করব না; নেবো তীর-ধনুক।
এমনি বেকার; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই;
দেহ না-চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক।
(প্রস্তাব/সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

২. *আমেরিকা ভালো, চীন ভালো...*
স্ট্রম্যান পাঠাবে অন্ন আমাদের কাল
হৃদয় জুড়ালো।
(মুখোশ/বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

৩. *সিন্দুক নেই; স্বর্ণ আনিনি,*
এনেছি ভিক্ষালব্ধ ধান্য।
ও দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাবো কি পরশ যৎসামান্য?
(জন্মদিনে/অরুণকুমার সরকার)

৪. *আমার দিনমান আপনমনে শুধু মনের পথ হাঁটা*
আমার সারারাত মনের তারাভরা আকাশে তারা গোনা
এমনই লোকে লোকারণ্য সংসার আমি ছিলাম একা,
ঘরের কোণে ছিলো একটি মুখ সে-ই আমার ভালোবাসা।
(আমার ভালোবাসা/মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

৫. *গণক প্রেমিক ভিক্ষুকে গুলজার*
রূপসী শহর— কোথায় আরশি তার?
(আরশিনগর/রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী)

৬. *দিন ভরে ওঠে স্বাদে, ভরে রাত,*
তুমি কাছে নাই।
বসন্তের জানালায় মাঘের রাতের শীত
একলা পোহাই।
(মাঘ শেষ হয়ে আসে/নরেশ গুহ)

৭. *না, সে নয়। অন্য কেউ এসেছিলো। ঘুমো, তুই ঘুমো।*
এখনো রয়েছে রাত্রি, রোদ্দুরের চুমো
লাগেনি শিশিরে।
(সহোদরা/নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

৮. *ওই যে সাগর স্রোতের মতন মুক্তির ঢেউ আসে*
বাঁধ কেটে দাও বাঁধ কেটে দাও আর কোন ভয় নেই
উত্তরমেঘে আশ্বাস পাই পৃথিবী যে আমাদের।

প্রবঞ্চনার মরীচিকা মুছে তলোয়ার হয়ে জ্বলি
প্রাচীন দেওয়ালে কুঁদে লিখে রাখি ঘৃণার গায়ত্রী।
(উত্তর মেঘ/রাম বসু)

৯. *ঘটনা হিশেবে আত্মহত্যা অতীব মুখ্য।*
পরলোক বলে যদি কিছু থাকে
তুই যা হারালি পাবি না তো তাকে—
আর কার, বল, তোর দুঃখের তুল্য দুঃখ।
(মূল্য/অরবিন্দ গুহ)

১০. *রমণী তার জানলা খুলবে না কোনদিন*
অর্থাৎ নয়ন,
পাছে এমন কিছু সে দেখে ফেলে
যা তার চেয়েও সুন্দর, অর্থাৎ রমণীয়।
(শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়)

১১. *সব তো ঠিক করাই আছে। এখন কেবল বিদায় নেওয়া,*
সবার দিকে চোখ,
যাবার বেলায় প্রণাম, প্রণাম!
(ছুটি/শঙ্খ ঘোষ)

১২. *হয়তো সেই শুকসারী ছাদের উপর এসেছিলো।*
সেই মুহূর্তেই যদি দরজা খুলতে তবে
তারা বলে দিত ঠিক পুবে না উত্তরে যেতে হবে।
ছাদের কার্নিশে দুইজনে
তোমার অপেক্ষা করে ক্লান্ত খুব দুঃখ পেয়েছিলো।
(অন্তরালে/আলোক সরকার)

১৩. *বলেছ প্রস্তুত থাক আমি এসে নিয়ে যাব তোকে*
সেই থেকে বসে আছি সব কাজ ব্যর্থ অবসান
(উন্মেষ/সুধেন্দু মল্লিক)

১৪. *তুমি যে বলেছিলে রাত্রি হলে*
মুখোশ খুলে দেবে বিভোর বিভা,
অহংকার ভুলে অরুন্ধতী
বশিষ্ঠের কোলে মূর্ছা যাবে!
রাত্রি হলো।
(একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকীতে/অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

১৫. *আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে, সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ*
দীর্ঘ দাঁতের করাত ও ঢেউ নীল দিগন্ত সমান করে
বালিতে আধ-কোমর বন্ধ
এই আনন্দময় কবরে
আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ।
(এক অসুখে দু'জন অন্ধ/শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

১৬. *...নীরা, আমি তোমার অমন*
সুন্দর মুখে বাঁকা টিপের দিকে চেয়ে থাকবো। আমি
অন্য কথা
বলার সময় তোমার প্রস্ফুটিত মুখখানি আদর করবো
মনে মনে
ঘরভর্তি লোকের মধ্যেও আমি তোমার দিকে
নিজস্ব চোখে তাকাবো।
(নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

১৭. *অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতার*
সংবাদের মতো আমি জেনেছি তোমাকে; বাতাসের
নীলাভতা হেতু দিনে আকাশকে নীল মনে হয়।
বালুময় বেলাভূমি চিত্রিত করার পরেকার
তরঙ্গের মতো লুপ্ত, অবলুপ্ত তুমি, মনোলীনা।
(আমার ঈশ্বরীকে/বিনয় মজুমদার)

১৮. *ভাঙা ঘরে, মস্ত একটা হাওয়ায়*
মানুষ কাঁপছে;
একটা হাত পাশের মানুষীকে
ধরে আছে, আরেকটা হাত
কোথায় রাখবে— বুঝতে পারছে না,
পায়রা এসে বসেছে নিমগাছে।
(মানুষ, ১৯৬১/প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত)

ইতস্ততভাবে নেওয়া কবিতাংশগুলি সচেতন ও শিক্ষিত পাঠককে স্বীকার করতে বাধ্য করবে, এগুলি একেবারে অন্য ছাঁদের, অন্য স্বাদের কবিতা। বাংলা কবিতার বহমান ধারা লক্ষ করলে আমরা দেখি, ধর্মীয় বা ভক্তিরসের কবিতার পর্ব শেষ হলে বাঙালি কবিরা গীতিকবিতার 'intense personal feelings'-কে গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথই ব্যতিক্রমী, যিনি ব্যক্তিগতকে বিশ্বগত করে তুলেছিলেন। তাঁর 'আমি' একক নয়; বহু। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিরা আবার ব্যক্তি-আমির বন্দনায় মুখর হলেন। গোবিন্দচন্দ্র দাস বললেন— " আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ।" বুদ্ধদেব বসু লিখলেন, "আমি যে রচিব কাব্য এ উদ্দেশ্য ছিলো না বিধাতার।" আর জীবনানন্দ দাশের কবিতায় পেলাম এই উচ্চারণ : "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।"

চল্লিশের কবিদের কবিতার মূল সুর সমাজগত; নির্দিষ্ট করে বললে, তার সুর রাজনৈতিক। সুভাষ-সুকান্ত-বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রাম বসু প্রমুখের কবিতা যার দৃষ্টান্ত। তবে তাঁরা যে প্রেমের কবিতা লেখেননি, রোমান্টিক জগৎ থেকে দূরে ছিলেন এটাও সত্য নয়। বরং প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যভাবনার সঙ্গে এঁদের কাব্যাদর্শ যেন প্রতিতুলিত হতে পারে। যিনি একদিকে বলেন,

ছোট এই আশা, সুখ
ঈর্ষা করি না, ঘৃণা নহে ভাই, শুধু নহি উৎসুক।
(সুদূরের আহ্বান)

অন্যদিকে তিনি লেখেন,

খেয়ার নায়ে, ওপারে যেতে কবে যে কোন্ ভিড়ে
একটা মুখ এক নিমেষে ওকূল স্রোতে ভাসায়।
কার সে মুখ, কার?
(মুখ)

চল্লিশের অরুণ সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেশ গুহ প্রমুখের কবিতায় পাই রোমান্টিক বেদনা ও স্বপ্নচারিতা। মেধা ও প্রজ্ঞার আশ্চর্য সম্মিলন ঘটেছে রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর কবিতায়।

পঞ্চাশের কবিরা কবিতাকে আত্মগত করে তুললেন। আত্মসমীক্ষা, আত্মবিলাপ, আত্মকথা হয়ে উঠল তাঁদের কবিতার বিষয়। পাশাপাশি কারও কবিতায় পাই দৃশ্যমুগ্ধতা, আত্মদর্শন। কেউ কেউ সমাজ ও রাজনীতি প্রসঙ্গ উপজীব্য করেছেন এও দেখা যায়। যেমন, কবি তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ। এরই পাশে আস্তিক্যবাদী কবিতার আধুনিক মেজাজ পাওয়া যায় অলোকরঞ্জন বা সুধেন্দু মল্লিকের কবিতায়।

কালগত দিক থেকে দেখলে ষাট বা ছয়ের দশককে আলাদা গুরুত্ব দিতে হয়। শুধু কবিতার জন্য এই দশক জুড়ে যে-আন্দোলন হয়েছে তা ঐতিহাসিক ও স্মরণীয়। অন্তত চারটি আন্দোলন উল্লেখযোগ্য— হাংরি জেনারেশন, শ্রুতি, ধ্বংসকালীন ও প্রকল্পনা। এর মধ্যে প্রথম দুটি আন্দোলন ব্যাপকতা পেয়েছিল।

১৯৬২-র এপ্রিলে মলয় রায়চৌধুরী যে-বুলেটিন প্রকাশ করলেন তার মাধ্যমে হাংরি আন্দোলনের মেজাজ ধরা পড়ল। মোট চোদ্দটি ভাবনাসূত্র ছিল সেই ইস্তাহারে। যার মধ্যে কয়েকটি এইরকম—

1. The merciless exposure of the self in its entirety.
2. To present in all nakedness all aspects of the self and thing before.
3. To challenge every value with a view to accepting or rejecting the same.
4. Not to take reality as it is but to examine it in all its aspects.
5. To use the same words in poetry as are used in ordinary conversation.
6. To reject traditional forms of poetry and allow poetry to take its original forms.
7. Personal ultimatum.

হাংরির কবিদের সম্পর্কে এই প্রচার শুরু হল, তাঁরা অশ্লীলতার সপক্ষে এবং সুস্থ সংস্কৃতির পরিপন্থী। ফলে কোর্ট-পুলিশ পর্যন্ত ব্যাপার গড়ায়। রিপোর্টে বলা হয়, হাংরিরা চেয়েছেন 'to corrupt the minds of the common reader.' ফলে গ্রেপ্তার হন মলয় রায়চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, দেবী রায় প্রমুখ।

প্রথাগত কবিতালেখা ও কাব্যভাবনার শুচিশীলিত পরিমণ্ডল ছিঁড়তে চেয়েছিলেন হাংরি গোষ্ঠীর কবিরা। যৌনতা প্রচার বা পর্নোগ্রাফি লেখা আদৌ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। কবিতাকে উলঙ্গ করে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছিলেন। যা তৎকালে পাঠকের কাছে ছিল 'শকিং' অভিজ্ঞতা। মলয় রায়চৌধুরীর বিতর্কিত ও নিষিদ্ধ কবিতা 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি পড়া যাক—

অথচ আমি চেয়েছিলুম আলেয়ার নতুন জবার মতো
যোনির সুস্থতা
যোনিকেশরে কাচের টুকরোর মতো ঘামের সুস্থতা
আমি মগজির শরণাপন্ন বিপর্যয়ের দিকে চলে এলুম
আমি বুঝতে পারছি না কিজন্য আমি বেঁচে থাকতে চাইছি

হাংরি গোষ্ঠীর অন্যান্য কবিদের রচনাংশ এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যায়, যা চিনিয়ে দেয় বাংলা কবিতার স্বাধীনতা-উত্তর গতিপ্রকৃতিকে।

১. *চলে যাবে বিদেশে জাহাজ*
আমি ঐ অ্যালুমিনিয়মের মত সবল চৌকাঠে
যৌনাঙ্গ ঘষে পড়ে যাব
আজ আমি পরিশ্রমের দাম চাই
(শৈলেশ্বর ঘোষ)

২. *ভালোবাসা ও সততার বদলে পৃথিবীর লাথি*
চমৎকার— ভালো, খুবই ভালো, দারুণ পৃথিবী
মধুময়, অমৃত
পাপী ও বিশ্বাসঘাতিনীদের মধুময় বলে যেতে হবে নাকি?
(সুবো আচার্য)

৩. *অণ্ডকোষের ভয়াবহতা জরায়ুর হিংস্রতার কাছে কিছুই নয়*
এই সত্য জানা গ্যালে পর কেন কাঁদতে হয়—
নির্বাসিত উজ্জ্বল দ্বীপে বসে
আমি কাঁদছি আমি হাসছি
(দেবী রায়)

কবি ও প্রাবন্ধিক উত্তম দাশ মনে করেন, "হাংরি রচনায় ব্যক্তিই সব গল্প কবিতার মূলসূত্র।" (দ্র. হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন)। মলয় রায়চৌধুরীর মতে, আত্মার ইরিটেশন থেকে হাংরি কবিতার জন্ম।

১৯৬৫ সালের এপ্রিলে জন্ম নেয় 'শ্রুতি' পত্রিকা। উদ্যোক্তা পুষ্কর দাশগুপ্ত; প্রকাশক মৃণাল বসুচৌধুরী। প্রথম সংখ্যায় শ্রুতি-কবিতা প্রসঙ্গে জানানো হয়— "জৈব আর্তনাদ কিংবা সমাজচিন্তার স্থান যেখানেই হোক, কবিতায় নয়।" কবিকে শিক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এ-ছাড়া ইস্তাহারে লেখা হয়—

১. কোনোরকম ব্যাখ্যা, বিধান বা তত্ত্ব প্রচারের দায়িত্ব কবিতার নেই।
২. চিৎকার বা বিকৃতি এর কোনোটাই কবিতা নয়।
৩. কবিতা হবে ব্যক্তিগত মগ্ন এবং একান্তই অন্তর্মুখী।
৪. আমরা বিশ্বাস করি কবিতা হয়ে ওঠা ছাড়া কবিতার আর কোনো চেষ্টা বা উদ্দেশ্য নেই।
৫. কবিতার একমাত্র অবলম্বন কবি/ব্যক্তির বিশেষ মানসিকতা এবং আন্তরিক অভিজ্ঞতা।
৬. ছেদচিহ্নের বিলোপ। কবিতার ভাষা হবে মুখের ভাষার সদৃশ।
৭. প্রচলিত ছন্দকে বর্জন ক'রে বা ভেঙে কবিতার ভাষায় ব্যক্তিগত উচ্চারণের স্বতন্ত্র স্পন্দন সৃষ্টি।
৮. কবিতার বিন্যাসে মুদ্রণের গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে তা দৃষ্টিগ্রাহ্য ও উপলব্ধির সহায়ক হয়।

বিভিন্ন সংখ্যায় যে-সব ভাবনা শ্রুতি-র কবিরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার থেকে নির্বাচিত আটটি সূত্র দেওয়া হল, যার দ্বারা বাংলা কবিতার রূপ-রূপান্তর চেনা যায়। শ্রুতি আন্দোলনে যুক্ত কবিরা হলেন— পুষ্কর দাশগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, পরেশ মণ্ডল, অনন্ত দাশ, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অতীন্দ্রিয় পাঠক প্রমুখ। এঁদের কবিতার কিছু দৃষ্টান্ত দিই।

১. রাস্তা
বাস
ট্রাম
গাড়ী *(পুষ্কর দাশগুপ্ত)*

২. এ
কা
কী
প্র তি ধ্ব নি
নী
র
ব
জ্যোৎস্নায় *(পরেশ মণ্ডল)*

৩. কলঘরে জল ঢালার শব্দ—
তারপর
বারান্দায় স্লিপারের শব্দ—
তারপর
শোবার ঘরে পাউডারের গন্ধ—
আমার সিগারের গন্ধ ঢেকে দিচ্ছে। *(সজল বন্দ্যোপাধ্যায়)*

৪. এখনো তোমার দিকে চেয়ে
আমি রাত দিন
সমস্ত যন্ত্রণা আর
অবিরল সমুদ্রের স্বর ভুলে আছি। *(মৃণাল বসুচৌধুরী)*

৫. এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে
কয়েকটি ভৌতিক ঘোড়া
দরজা খুললেই তারা দৌড়বে এক একদিকে
নানা রঙে আর রেখায়
আমার কাজ হবে তাদের অনুসরণ করা
(অশোক চট্টোপাধ্যায়)

এইসব কবিতা অবশ্যই তত্ত্ব বা তথ্য নিয়ে আসে না। অনুভূতি আর দৃশ্যময়তা তৈরি করে স্বতন্ত্র কবিতার ভুবন।

১৯৬৬-তে ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলন শুরু হয় 'সাম্প্রতিক' পত্রিকায়। যাঁরা চেয়েছিলেন—

১. প্রকৃতির মতো উদার আর অকৃত্রিম হবে কবিতা
২. কবিতাই কবির জীবনদর্শন হবে
৩. ঐতিহ্য মেনেই নতুন বোধে উত্তরণ ঘটাতে হবে
৪. প্রজ্ঞাময় আত্মবোধের স্বনির্ভর উচ্চারণে বিশ্বাস
৫. ধ্বংসকালীন আসলে সৃষ্টিকালীন।

এই নব্য কাব্যভাবনার অংশীদার ছিলেন সুকোমল রায়চৌধুরী, প্রভাত চৌধুরী, অঞ্জন কর, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, দীপেন রায় প্রমুখ। এঁরা যেভাবে কবিতা লিখতে চেয়েছিলেন তার কিছু উদাহরণ—

১. *বীভৎস জ্যোৎস্নায় কারা হরিধ্বনি দ্যায়*
কারা যেন কবরে কবরে ভিড় করে
প্রেতাত্মার পাশাপাশি আমি হাঁটি সুড়ঙ্গের পথে

(প্রভাত চৌধুরী)

২. *প্রচণ্ড কম্পনে*
নিভে যায় পৃথিবীর
বুকের মশাল
লণ্ডভণ্ড পাঁজরের হাড়

(সুকোমল রায়চৌধুরী)

কবিতার আঙ্গিক নিয়ে প্রকল্পনা কবিতা আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬৯-এ। ভট্টাচার্য চন্দন এর প্রবর্তক। 'স্বতোৎসার' পত্রিকায় এঁদের বক্তব্য এইভাবে প্রকাশিত হয়েছিল—

১. প্রচলিত কোনো নির্দিষ্ট ফর্মে বিশ্বাসী নই আমরা।
২. প্রথার শৃঙ্খল থেকে রোদনার্ত সাহিত্যকে মুক্ত করতে চাই প্রকল্পনা আন্দোলনের মাধ্যমে।
৩. সাহিত্য হবে স্বতোৎসারিত অনুভব ও চৈতন্য প্রবাহের যথার্থ রেকর্ড (Automatic writing)।
৪. আমাদের লক্ষ্য শব্দের সীমানা অতিক্রম।
৫. জীবন সম্পর্কে কোনো কথাই শেষ কথা নয়।

এই কাব্যান্দোলনে যুক্ত ছিলেন উত্তর বসু, দিলীপ গুপ্ত, তপন ঘোষ, শুক্লা মজুমদার প্রমুখ। দুজন কবির কবিতাংশ উদ্ধৃত করে প্রকল্পনা গোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীণ কবিতা আন্দোলনের রূপটি দেখানো যেতে পারে।

১. *পৃথিবীর তাবৎ বাজারে ওৎ পেতে থাকে*
অভিজ্ঞ ফোড়ের চোখ
শুধু চোখে
দর ওঠে দর নেমে যায়—
যে জানে
শরীর পেতে তুলে নেয় প্রেম।

(উত্তর বসু)

২. *এ্যাইও উজবুক চুপচাপ থাকবে*
আগুন নিয়ে খেল্লেই মরবে
তবেই না সব চলছে চলবে

(ভট্টাচার্য চন্দন)

বাংলা কবিতা বাঁধা পথ ছেড়ে চলে যেতে চায় অন্য কোনো পথে, এ-সবই তার দৃষ্টান্ত। যদিও প্রশ্ন থাকে, এইসব কাব্য-আন্দোলন যতটা নাড়া দেয়, প্রাণে সাড়া দেয় কি না। চোখ ভোলাবার, মন দোলাবার আয়োজন থাকলেও কবিতার সেই নান্দনিক বোধ সর্বদা মেলে না এও সত্য।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবিপত্র'ও নতুন একটা কাব্যান্দোলন তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যার নাম ছিল 'থার্ড লিটারেচার'। পূর্ববর্তী কবি ও কাব্যান্দোলনের বক্তব্যই নতুন করে তাঁরা বলেছেন। তথাকথিত কবিতার আভিজাত্য অস্বীকারই এঁদের লক্ষ্য। কিন্তু কবিতা যে মানুষের জন্য, পাঠকের জন্য—এই সত্য তাঁরাও মেনেছেন।

প্রচারের আলোয় মাখা বড় কবি না-হলেও কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় 'শ্রমিক কবি' অভিধায় তৃপ্ত। কেননা দুর্গাপুরের কারখানায় হাতেকলমে তিনি শ্রম করেছেন। তাঁর মতাদর্শ বামপন্থী। কিন্তু অন্ধ আনুগত্য নেই। যেজন্য তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে লিখতে পারেন সেই কাব্য যার নাম "কমরেড, লাইনটা সোজা করুন।" রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মাঝখানে এই সতর্কবাণী এক কবির বিবেকী ও সামাজিক ভূমিকা স্পষ্ট করে নিশ্চয়।

ষাটের দশকের উপান্তে এ-দেশে যে নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা পরিপূর্ণতা পায় সত্তরের দশকে। প্রধানত কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে দাবি আদায়ের জন্য এই লড়াই শুরু হয়। কিন্তু ক্রমে তা অপশাসন, শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের রূপ নেয়। 'খতম অভিযান' সারা পশ্চিমবঙ্গে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। বহু যুবক মারা যায়। পুলিশ তাদের হত্যা করে। এক নতুন পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ার অঙ্গীকার নকশালবাড়ি আন্দোলনের লক্ষ্য হলেও শেষ পর্যন্ত তা পথভ্রষ্ট হয়। কিন্তু বিপ্লবের এই লাল আগুন ছড়িয়ে পড়ে শহরে ও গ্রামে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে দেশজুড়ে

কী কী ঘটনা ঘটেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যায়।

১৯৬৭ — আরব-ইজরায়েলের যুদ্ধ। নিহত হন চে গুয়েভারা।
নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূচনা।
যুক্তফ্রন্টে ভাঙন।

১৯৬৯ — চাঁদে নিল আর্মস্ট্রংদের প্রথম পদার্পণ।
হো চি মিন মারা গেলেন।
CPI (ML) দলের প্রতিষ্ঠা।
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন।

১৯৭০ — যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ও দেশজুড়ে অস্থিরতা।
রাষ্ট্রপতির শাসন।
খতমের রাজনীতি। মূর্তিভাঙা।
নকশাল আন্দোলনের ব্যাপকতা।

১৯৭১ — নতুন বাংলাদেশের জন্ম।
পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীর ভিড়।
রাষ্ট্রপতি শাসন জারি পশ্চিমবঙ্গে।
নকশাল আন্দোলন তীব্রতর।

১৯৭৪ — ভিয়েতনামে যুদ্ধ।
ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট।
জয়প্রকাশ নারায়ণ-এর সর্বাত্মক বিপ্লবের আহ্বান।

১৯৭৫ — বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান নিহত হলেন।
দেশজুড়ে জরুরি আইন ঘোষণা।
মিসায় বন্দি হলেন কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা।

১৯৭৬ — মারা গেলেন মাও-সে-তুং।
জয়প্রকাশের গণ-আন্দোলন।
চাসনালা খনি দুর্ঘটনায় ৪০০ জন শ্রমিকের মৃত্যু।

১৯৭৭ — পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট জয়ী হল।
লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারিয়ে ক্ষমতায় এল জনতা সরকার।
প্রধানমন্ত্রী হলেন মোরারজি দেশাই। জরুরি অবস্থার অবসান।

দেশকালের এই পরিস্থিতিতে হত্যা আর সন্ত্রাস সকলের মনে যে-ভয় জাগিয়েছিল, যে-স্বপ্ন দেখিয়েছিল তা বিভিন্ন কবির লেখায় ফুটে উঠেছিল। কোনো কাব্যান্দোলন নয়, জীবনের জন্য লড়াই এইসব কবিতাকে সজীব, রক্তাক্ত করেছিল। যেখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটের কবিরাও কলম ধরেছিলেন। কয়েকজন কবির কবিতাংশ এর সমর্থনে উল্লেখ করছি।

১. *যা লেখো যা ইচ্ছে লেখো কিন্তু খবরদার—*
দিও না সাপের লেজে পা,
বলো না, নরখাদক বাঘ মানুষের মাংস খায়
(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

২. *বড়ো বেশি দেখা হলো যা দেখার পাপে শরীরের*
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভ'রে যায় ত্রাণহীন নীরন্ধ্র কালিমা
(শঙ্খ ঘোষ)

৩. *জেলখানায় অদ্ভুত সেই স্যাঁতসেতে ঘর, মনে পড়ে*
বন্ধুদের, যারা
ভালোবাসতো আশ্চর্য এক বেঁচে থাকার কথাই
শুধু ভাবতে ভাবতে, বাতাসে
যাদের রক্তের গন্ধ
আজ বারুদের গন্ধে মিশে গ্যাছে।
(বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত)

সত্তরের কবিরা আগুনের মধ্যে হেঁটেছেন। তাই তাঁদের কবিতার ভাষা ও ভঙ্গি অন্যরকম।

১. *এক লক্ষ*
এক লক্ষ সজ্জিত মানুষ
উত্তরের পলাশফোটা মাঠে
তাদের,
তাদের বুকের আগুন
নিঙড়িয়ে নিঙড়িয়ে
স্তূপাকার করছে। (কমলেশ সেন)

২. *আমি সমীর, জলকে মাথায় করে বিদ্যুৎ নাচাবো*
প্রভাসনলিনী মা আমার, মা আমার
দেখিস, দেখিস, আমি তোর পুত্র ঠিক হবো।
(সমীর রায়)

৩. *এবার প্রস্তুত কোনো অদ্বিতীয় অতিক্রমে, আমি*
পার হতে হতে সব ঘনিষ্ঠ সংস্থান
মনে হবে সমষ্টির মর্যাদায় ভূষিত, তখনো
দূরতম নক্ষত্রস্পর্শের পরিত্রাণ।
(মণিভূষণ ভট্টাচার্য)

৪. *অন্নের নিটোল গ্রাস আটকে যায়*
গলায় নলীতে
দুধলি ঘাসের বুকে পড়ে থাকে নিহত প্রবীর।
(সব্যসাচী দেব)

৫. *পোস্টার অথবা কবিতা*
যে যা খুশি ভেবে নিতে পারে
আমি চাই কথাগুলো আটটা পাঁচটার গেটে
অনায়াসে মিশে যাক
তেতে উঠুক অবস্থানের তাঁবু।

(পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়)

৬. *ডাকো, যেন মেঘ ডেকে ওঠে*
ডাকে, যেন সমুদ্র গর্জায়
ডাকো, ডাকে যেন বেজে ওঠে শাঁখ।...
দারুণ গভীর থেকে ডাক দাও— মানুষের মা—
ও মাটির মা।

(রঞ্জিত গুপ্ত)

৭. *তবু হাতে থাকে হাতের নির্ভর*
বুকে জাগে উদ্ভিদের স্বর
সভ্যতার গুল্মময় শরীরের পাশে।
কেউ কেউ বাড়ির পথে দীর্ঘযাত্রা শুরু করে
তখন তাদের স্বপ্ন জুড়ে হাওয়া সবুজ ঢেউ তোলে
বিশাল প্রান্তরে।

(তড়িৎ চৌধুরী)

ষাট ও সত্তরের দশক জুড়ে নানা স্বাদের ও নানা বিষয়ের কবিতা লেখা হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় শুধু এক বিশেষ ভঙ্গি ও ভাবনাকে দেখানো হল— যা উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে লেখা বাংলা কবিতার পালাবদলের নানা মুদ্রা প্রকাশ করেছে। সাহিত্যিক আন্দোলনগুলি ফলপ্রসূ হল কি না অথবা তার যৌক্তিকতা কোথায়, এমনতরো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসকারেরা করবেন। রবীন্দ্রনাথের পর বাঙালি কবিরা বাংলা কবিতা নিয়ে যে ক্রমাগত ভেবেছেন, ছাঁচ ভেঙেছেন, অন্য কিছু বলতে বা করতে চেয়েছেন, এগুলি তারই নিদর্শন। আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে এইসব কবিতা নবতর বার্তা ও ব্যঞ্জনা আনতে চায়, এতে সন্দেহ নেই। শাশ্বত কি না, সে-বিচার করবেন মহাকাল।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতায় সমাজমনস্কতা অন্যতম লক্ষণ রূপে চিহ্নিত হতে পারে। মুখ্যত তিরিশের কবিরা চল্লিশে ও উত্তর-চল্লিশে লেখা কবিতায় দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন, যদিও চল্লিশের বা চারের দশকের কবিরা এ-ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর বলা যায়। জীবনানন্দ দাশের 'সাতটি তারার তিমির' কিংবা 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যে দেশকাল ও সমাজসংসক্ত ছবি দুর্লভ নয়।

প্রশান্তিই প্রাণরণনের সত্য শেষ কথা, তাই
চোখ বুজে নীরবে থেমেছি।
ফ্যাক্টরির সিটি এসে ডাকে যদি,
ব্রেন কামানের শব্দ হয়,
লরিতে বোঝাই করা হিংস্র মানবিকী
অথবা অহিংস নিত্য মৃতদের ভিড়
উদ্দাম বৈভবে যদি রাজপথ ভেঙে চ'লে যায়,
ওরা যদি কালোবাজারের মোহে মাতে,
নারীমূল্যে অন্ন বিক্রী করে,
মানুষের দাম যদি জল হয়, আহা,
বহমান ইতিহাসমরুকণিকার
পিপাসা মেটাতে
ওরা যদি আমাদের ডাক দিয়ে যায়— (মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'সংবর্ত' বা 'দশমী' কাব্যে আত্মগত জগৎ থেকে বাইরে তাকাতে চেয়েছেন। পৃথিবী যখন মুখর 'একনায়কের স্তবে', তখন তাঁর মনে হয়েছে—

অতএব কারো পথ চেয়ে লাভ নেই
অমোঘ নিধন শ্রেয়ো তো স্বধর্মেই
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী— (প্রতীক্ষা)

নিজেকে 'ইতরের কবি' ঘোষণা করে প্রেমেন্দ্র মিত্র সমাজের সমস্যা, দুঃখকষ্ট লিপিবদ্ধ করেছেন। 'হরিণ-চিতা-চিল' কাব্যে ও নামাঙ্কিত কবিতায় সভ্যতার মেকি রূপ ধ্বংস করতে চেয়েছেন। শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সহমর্মিতায় গড়ে তুলতে চেয়েছেন সেই 'বেনামী বন্দর', যেখানে শুধু হতভাগাদের ভিড়।

মননজীবী ও মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী কবি বিষ্ণু দে বারংবার এই সমাজের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। 'অন্বিষ্ট' কবিতায় দেখান,

তারি মাঝে আসে ওরা
দিনের মজুর দিন আনে হাতে হাতে
রুজির সংঘাতে।

দেখতে পান,

বর-বধূ রোমান্টিক বাসরঘর একালে বদলে গেছে।
শুধু নেই বধূ, নেই, সে গিয়েছে আউশের বিলে,
বর নেই, বর কোথা জগদ্দলে মুনিষ মিছিলে

(রথযাত্রা, ঈদমুবারক)

লালকমল ও নীলকমলকে রূপকথার জগৎ থেকে বিনির্মাণ করেন, সমাজ বদলানোর কাজে। শোষণ ও পীড়নের ছবি অন্যভাবে আঁকেন অরুণ মিত্র—

আর একটু সবুর করো পিয়ারিয়া,
ভালোবাসার কথা ভাবো,
বালবাচ্চা এন্ডিগেন্ডি ভালোবাসা থেকেই এসেছে
মালিক মাল্‌কানি ভালোবাসার মুখ চেয়েই
তোমাকে ভিড়িয়ে দিয়েছেন রাত্তিরে ...

(চারপাইয়ের ওপর)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে উদ্দীপিত হয়েও খুশি হতে পারেন না। কারণ দেখতে পান,

যার হাত আছে তার কাজ নেই,
যার কাজ আছে তার ভাত নেই,
আর, যার ভাত আছে তার হাত নেই।

(মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও লক্ষ করেন—

আমার ভারতবর্ষ
পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের—

(আমার ভারতবর্ষ)

পঞ্চাশের কবি শঙ্খ ঘোষ সামাজিক সমস্যাকে অন্যভাবে দেখেছেন—

বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া
তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত
নিওন আলোয় পণ্য হলো
যা কিছু আজ ব্যক্তিগত।

(মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে)

তাঁর 'বাবরের প্রার্থনা' সমাজমনস্ক কবির অভ্রান্ত পরিচয় দেয়।

কবিতা নিয়ে তারুণ্যের নতুন মেজাজ নিয়ে এল 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা (১৯৫৩)। মূল কাণ্ডারি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সহযোগী দীপক মজুমদার ও আনন্দ বাগচী। পরে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। 'কৃত্তিবাস' কবিদের অহং ও অভিমানকে গুরুত্ব দিয়েছিল। পত্রিকার উদ্দেশ্য— "তীব্র, উদাসীন, উন্মত্ত, ধীমান, ক্রুদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, শান্ত, বিটনিক, ভয়ঙ্কর, মগ্ন, চতুর, সৎ, ভূতগ্রস্ত, ধার্মিক ও অতৃপ্ত কবিদের ব্যক্তিগত রচনা, কবিতা ও বিস্ফোরণ।" এখানে লিখলেন শঙ্খ ঘোষ, সুধেন্দু মল্লিক, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পঞ্চাশের সমস্ত কবিকুল। কবিতার ভাষায় কথা বলাই এঁদের উদ্দেশ্য। কাব্যিকতা বর্জিত হল। দৈনন্দিন জীবনযাপন উঠে এল কবিতার উপাদান রূপে। ছন্দ ভাঙা ও গড়ার অপরূপ কৌশল দেখা গেল তাঁদের কবিতায়। যা এই সময়ের তরুণ কবিদের প্রেরণাস্থল হয়ে আছে। যদিও আশি আর নব্বইয়ের দশকের কবিরা সেইভাবে একক মহিমায় উদ্ভাসিত হতে পারেননি। সত্তরের কবিরাই এখন পর্যন্ত পাঠকপ্রিয় হয়েছেন, অন্তত পরিসংখ্যান নিলে প্রমাণিত হবে। সত্তরের কবিদের মধ্যে কিছু পরিচিত মুখ— জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার, মৃদুল দাশগুপ্ত, সুব্রত রুদ্র, রণজিৎ দাশ, ধূর্জটি চন্দ, রমা ঘোষ, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, দেবদাস আচার্য, সুজিত সরকার, শ্যামলকান্তি দাশ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বড় পত্রিকার আনুকূল্যে যশ-প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তবে কবিপ্রতিভা তাঁদের আছে, মানতেই হবে। জয় গোস্বামীর কবিতায় লিরিকের টান, বিষাদ ও আত্মমগ্নতা পাঠককে স্পর্শ করে। অন্যদিকে সুবোধ সরকারের কবিতায় গল্পাভাস ও প্রতিবাদী মেজাজ আলাদা স্বাদ আনে। জীবনযাপনের ও সমাজের নানা বাঁক স্পর্শ করেন রণজিৎ দাশ, মৃদুল দাশগুপ্ত, রমানাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ কবিরা। এঁদের নানা কণ্ঠস্বরের কিছু নমুনা দেখানো যাক—

১. *যদি জিগ্যেস করো একজন কবির কাজ কী হওয়া উচিত*
কেন তুমি এখনো শেখোনি— তাহলে
আমি শুধু বলবো একটি কণা
বলবো বালির একটি কণা থেকে আমি জন্মেছিলাম,

(জয় গোস্বামী)

২. *জীবনের রূপ ধ'রে মৃত্যু গীয়মান*
নৈঃশব্দ্যের পদধ্বনি চরাচর জুড়ে
সব ঝরাপাতা।

(রমানাথ ভট্টাচার্য)

৩. *দৌড়তে দৌড়তে ঘোড়া একদিন অন্ধ হয়ে যায়*
তুমি কি ফিরবে আর? তুমি কি ফিরবে কোনদিন?
যদি ফেরো, ক্ষণকাল দাঁড়িয়ো যতীন দাস রোডে
অন্ধ ঘোড়ার পিঠে অন্ধ যুবক আমি তোমার আশায়।

(সুবোধ সরকার)

৪. *যদি অহঙ্কার করো, ভেবো না ও মুখপানে ফিরেও তাকাবো আর*
এখনো প্রচুর ট্রেন উজ্জ্বল স্টেশনে আসে— মনে রেখো—
আমারই উদ্ধারে!
চেয়েছি তোমাকে দেবো নষ্ট প্রতিভার স্বাদ, ঠোঁট থেকে, রোমকূপ থেকে,
যার চেয়ে বেশি নোনা কিছু নেই পুরুষের নারীকে দেবার মতো;
(রণজিৎ দাশ)

ষাটের মতো সত্তরের দশকও কবিতায় ঋদ্ধ। যে-কবিতা শুধু চমক নয়, শব্দক্রীড়া নয়; অনুভবের সত্যে ও জীবনবোধে সঞ্জীবিত।

আশি ও নব্বইয়ের দশকে কবিতার আরেক রূপ প্রকাশিত হল। পূর্বজ কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণে এই সময়ের কবিদের যাত্রা শুরু হয়েছে। তবে দেশ-কাল-পরিস্থিতি একেবারে ভিন্নতর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমুন্নতি ঘটেছে। দূরদর্শনের কল্যাণে শোনা এখন দেখায় পর্যবসিত। পাঠযোগ্যতা শ্রাব্যের ও দৃশ্যের কাছে প্রায় পরাস্ত। আশির দশকের কবিরা দেখলেন—

১. ইন্দিরা গাঁধীর পুনরায় সরকার গঠন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব।
২. চাইবাসায় জনসভায় গণহত্যা।
৩. চার্লস-ডায়ানার রাজকীয় বিবাহ।
৪. মহাকাশে প্রথম ভারতীয় রাকেশ শর্মার অভিযান।
৫. অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশ।
৬. ইন্দিরা গাঁধী দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত।
৭. শ্রীলঙ্কায় যুদ্ধ ও অস্থিরতা।
৮. গুজরাটে দাঙ্গা।
৯. ভূপালে শোচনীয় গ্যাস-দুর্ঘটনা।
১০. ইথিওপিয়ায় দুর্ভিক্ষ।
১১. গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন।
১২. বোফর্স-বিতর্ক শুরু।
১৩. চিনে তিয়েনান-মেন স্কোয়ারে ছাত্রছাত্রীদের উপর সেনাবাহিনীর আক্রমণ ও হত্যা।

এই সময়ের কবিদের মধ্যে পাই জয়দেব বসু, জহর সেন মজুমদার, মল্লিকা সেনগুপ্ত, বীথি চট্টোপাধ্যায়, তমালিকা পণ্ডা শেঠ, সুতপা সেনগুপ্ত, বিজয় সিংহ, নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাহুল পুরকায়স্থ, সুমন গুণ, অদীপ ঘোষ, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতেশ মাইতি, নাসের হোসেন প্রমুখ। আশির দশকে মহিলা কবিদের প্রাধান্য ও আত্মপ্রকাশ চোখে পড়ার মতো। কবিতায় নারীবাদী চেতনার প্রকাশও এ-সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আশির কবিরা কীভাবে তাঁদের ভুবন তৈরি করতে চেয়েছেন অথবা কী ভাবতে চান তা কয়েকজন কবির কবিতাংশ উদ্ধৃত করলে হয়তো বোঝা যাবে। যেহেতু এঁদের কবিতা এখনও পরিণামমুখী, তাই শেষকথা বলা সম্ভব নয়। একই কথা বলা যায় নব্বইয়ের কবিদের সম্পর্কেও। এ-কথা ঠিক, এই দুই দশকের কবিরা ছন্দে ও শব্দসজ্জায় নিপুণ; অত্যন্ত স্মার্ট তাঁদের বাগ্‌ভঙ্গি ও কাব্যাঙ্গিক। কিন্তু যা চোখ টানে তা মন টানবে এমন তো নয়। কোনো বিশেষ জীবনদর্শন এঁদের লেখায় পাওয়া দুষ্কর। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো পঙ্‌ক্তি, কোনো চিত্রকল্প বা কোনো বক্তব্য পাঠককে চকিতে চমৎকৃত করে।

১. *না উড়েও ওড়া— এ এক চমৎকার রীতি, যা একমাত্র মানুষই পারে*
পায়রারা প্রেম করে, তবে এতখানি উড়তে উড়তে নয়।
(নাসের হোসেন)

২. *ওই মেয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে*
লিপস্টিকে ঢেকেছে কালো ঠোঁট,
লাল রং বেণী, কমলা সবুজ নখ—
বাঘ না ভালুক কে কখন খাবে অপেক্ষায় ...
ওই মেয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ...
(ঈশিতা ভাদুড়ী)

৩. *সপাং চাবুকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছি সঙ*
দড়িতে নাচছি লাফাচ্ছি হাত তুলে
সপাং চাবুকে বদলে মুখের রঙ
হা হা হা হাসছি সব ভুলে দিল খুলে।
(শতরূপা সান্যাল)

৪. *নিভৃত ঘর, ঘরের মধ্যে রোজ*
একা তোমার সেই মাধুরীলতা
অশ্রুহীন শুকনো দুটি চোখ
চোখের পাতায় স্থবির নীরবতা।
(বীথি চট্টোপাধ্যায়)

৫. *রহস্যে তোমাকে জানি, চৈত্রপরশে*
বলি : জাগো

কৃপাণ, ক্ষুধার ঢেউ; নীল আত্মহারা
স্মৃতিসহোদরা তুমি
তোমার নিকটে
আজ অতি ধীরে আসি, মন এই চায়।

(রাহুল পুরকায়স্থ)

৬. *একটি বাচ্চা মেয়ের মাথার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল রোগা পাঠ্যবইগুলি।*
ক্ষ্যাপা হাতির পিঠে বসে লণ্ডভণ্ড পৃথিবী দেখতে দেখতে
ভাবি— এ পৃথিবী সম্পূর্ণ অচল হাতির সুপরামর্শ ছাড়া।

(জহর সেন মজুমদার)

৭. *আজকাল প্রতিটা দিন তৈরি হয়*
আমাদের নখ তলপেটের আগুন ও স্বপ্ন নিয়ে।
স্বপ্ন ফুঃ।
আমি লাথি মেরে সরাচ্ছি ওসব।

(ধীমান চক্রবর্তী)

৮. *রোদের সরল ছায়া উঁচু উঁচু ডালে ও পাতায়।*
বাঁশবন, শুকনো পাতা জলে, চারপাশে
মাঠ, মাটির দাওয়ায় দুটি মোরগ,
বিকেল
তোমার দুঃখের মতো নিরুপায় ছড়িয়ে রয়েছে।

(সুমন গুণ)

উৎকলিত কবিতাংশ থেকে পাঠক টের পাবেন আশির কবিরা কোনো বিশেষ ভাবনাবলয়ে আবদ্ধ নন। ঈষৎ ব্যঙ্গ মিশিয়ে জীবন ও মানুষকে দেখেন নাসের। পণ্যা নারীর বিপন্নতা অথবা নারীজন্মের যন্ত্রণা ফুটে ওঠে ঈশিতা ও শতরূপার কবিতায়। জহর ম্যাজিক রিয়ালিটি নিয়ে আসেন তাঁর কবিতায় এবং অবশ্যই তার মধ্যে মিশে যায় প্রবল সমাজবীক্ষা। যা পাই ধীমানের লেখাতেও। সুমন গুণ ছোট ছোট দৃশ্যরূপে অন্তর্গত ভাব ও ভাবনাকে ব্যক্ত করেন— যা জলরঙে আঁকা ছবির মতো।

আশি বা আটের দশকের কবিদের মানসতা বা কাব্যাদর্শ কী তার সংহত রূপরেখা এঁকেছেন উত্থানপদ বিজলী তাঁর সম্পাদিত "কবিতা : দশক আশি" সংকলনের ভূমিকায়। তাঁর বক্তব্যের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

আশির দশকের কবিরা সকলেই স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষ।... স্বাধীনতা-উত্তরকালের অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক রীতিনীতির অবক্ষয়তার মধ্যে এরা সকলেই জন্মগ্রহণ করেছেন ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছেন।... উপলব্ধি করেছেন— স্নেহ-প্রীতির সূত্র অবধারিতভাবে ক্ষীণ এবং প্রেমে অনিবার্য কলুষতা ও বিশ্বাসহীনতা। তাই মনে হয়, তাদের আজ কোন আদর্শকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না এবং আদর্শের জন্য সংগ্রাম পরিলক্ষিত হয় না।

এই কারণে এই দশকের কবিরা কাব্যপ্রকরণে কোনো ভাঙচুর করেননি। পূর্বসূরিদের চলা পথে হেঁটেছেন। কারও কারও লেখায় স্বাতন্ত্র্য নেই এমন বলা যাবে না। আসলে সামগ্রিক বিচারে দু'একটি কোকিলের ডাকে বসন্ত এসেছে বলা অব্যাপ্তিদোষদুষ্ট হয়ে পড়ে। তবু আশির কিছু বহুশ্রুত নামের কবিদের কবিতাংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাতে চাই।

১. *বুঝে গেছো— বালি দিয়ে দুর্গগড়া জীবনে পবিত্রতম কাজ!*
তোমার জীবনে কোনো মাধ্যাকর্ষণের টান নেই!
তুমি কি শেখো নি সেই পূতঃ শিক্ষা অধঃপতনের!

(ঋজুরেখ চক্রবর্তী)

২. *ধর্মহীন হতে চাই, অথচ চারপাশে কোনো প্রতিপক্ষ নেই*
চৌকাঠের বৃত্ত জুড়ে এক সুর।

(কাজল চক্রবর্তী)

৩. *আমার জননীর গোপন যোনিপথে*
প্রসবকালে কোন যাদুকরী
মন্ত্রপড়ে বিষ লুকিয়ে ঢেলেছিলো
ডাইনী মেয়ে আমি জন্মেছি

(চৈতালী চট্টোপাধ্যায়)

৪. *ঘাসের মধ্যে ডুবে আছে আমার রাইফেল, দু'চোখে সন্দেহ*
বিশ্বাস হতে চায় না কিছুই
এই দ্বীপ আর মারাত্মক জীবনের খেলা!

(নাসের হোসেন)

৫. *ডেকে গেছে তাকে হেম হাতছানি, প্রেতায়িত গাঢ় দিনশেষ*
প্রস্রাব, থুথু, বিষ্ঠা মাড়িয়ে পেতে চেয়েছে সে নিজ দেশ।

(নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

৬. *এসো আমরা পরস্পর আলিঙ্গন করি, তারপর চুম্বন*
চুম্বনে কোনো ভাষা লাগে না এবং বড় বেশি ধর্মনিরপেক্ষ

(প্রবালকুমার বসু)

৭. *আগে*
নিজের একটা আকাশ তৈরি করো
তার নিচে একটা পৃথিবী গড়ো

(শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়)

৮. *শরীর জুড়ে অভিমানের ছন্দ এমন*
বুকের ধূ ধূ আগুন ছুঁতে
দুঃখ এলো তোমার মতন।

(সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়)

৯. *গরু মানুষ পাখি*
সবাই জমি তৈরির জন্য ঘাম ঝরাচ্ছে।

(রত্নাংশু বর্গী)

১০. *যে মেয়ে কবিতা লেখে, তর্ক করে, বিদগ্ধ, বিদুষী*
যে মেয়েরা ধান বোনে, ইট তোলে, অফিস চালায়
তাদের বর্ণনাযোগ্য শব্দ নেই তোমার কলমে
অর্ধেক বুঝেছ তুমি মহাকবি, মেয়েদের অর্ধেক বোঝনি।

(মল্লিকা সেনগুপ্ত)

সৎ পাঠকমাত্র স্বীকার করবেন, উৎকলিত কবিতাংশগুলি পূর্বজ কবিদের কাব্যবোধ, সমাজবোধ বা আঙ্গিকচেতনার থেকে অভিনব বা অনন্য হয়ে ওঠেনি। মল্লিকার নারীবাদী ভাবনার বলিষ্ঠতাও প্রাতিস্বিক নয়— কবিতা সিংহ থেকে কৃষ্ণা বসু, তসলিমা নাসরিন পর্যন্ত যা উদ্‌ভাসিত। বলার ভঙ্গি হয়তো ঈষৎ নতুন। অর্থাৎ বলতে চাই, আটের দশক বা আশির কবিরা বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত সঞ্চারিত করেননি। একই সিদ্ধান্ত নব্বইয়ের কবিতা প্রসঙ্গেও বলা যায়।

নয়ের দশক বা নব্বইয়ের কবিদের কাব্যভাবনা কী তাঁরা নিজমুখে যতটা বলেছেন, এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ।

পৌলোমী সেনগুপ্ত : কাকে যে কবিতা বলে, কাকে বলে না, তা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না।

সাম্যব্রত জোয়ারদার : কবিতা লিখে আমি কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি।

সব্যসাচী ভৌমিক : কোনওভাবেই কবি যা তার প্রতিফলন ঘটছে না তার কবিতায়। যা প্রতিফলিত হচ্ছে তা হল নিজবোধের কোনও বিকৃত উপস্থাপনা কিছু নির্দেশিত তত্ত্বের প্রেক্ষিতে।

রূপক চক্রবর্তী : যা খুশির নাম, যেভাবে খুশি কাটানোর নামই কবিতা।

সেবন্তী ঘোষ : পরিষ্কার করে জানাবার মতো আমার কোনও স্থির নির্দিষ্ট কবিতাভাবনা নেই।

বিভাস রায়চৌধুরী : জয় গোস্বামীর লম্বা ছায়া গায়ে মেখেছে বেশির ভাগ বন্ধু,... এভাবেই মৃদুল, শ্যামলকান্তি, রণজিৎ, সুবোধদের প্রভাব... আমরা নব্বইয়ের কবিতায় ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছি তাদের প্রভা।

বীথি চট্টোপাধ্যায় : এই সময়ের বাংলা কবিতায় বিশেষভাবে ফিরে এসেছে ছন্দ।... এই সময়ের কবিদের ভাষাশৈলী সহজ। এই সময়ের কবিদের মধ্যে আত্মাভিমানের থেকে আত্মপ্রত্যয়ই যেন বেশি।

যশোধরা রায়চৌধুরী : লিখতে লিখতে লেখা হয়েছে। সেজন্য দায়ী এই ধরা ছোঁয়ার পৃথিবীরই কয়েকটি ঘটনা, ফ্যাক্টর, মানুষ। আর কবিতা লেখা না হলেই বা কী হত? কার কী আসত যেত?

(সূত্র : অভিভব/ডিসেম্বর, ২০০১)

নব্বইয়ের কবিদের এই কাব্যচিন্তাই প্রমাণ করে, তাঁরা 'স্থির বিষয়ের দিকে' যেতে পারেননি। হাতে শব্দ, ছন্দ আছে, অতএব কবিতা লিখে ফেলা যাক। প্রমথ চৌধুরীর পরিহাসোক্তি মনে পড়ে—

প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালোবাসা
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
তারি লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন
দরকারী ভাব আর সরকারী ভাষা।

ছন্দে নৈপুণ্যই যদি কবি হওয়ার বড় গুণ ও শর্ত হয়, তো সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে সে-সম্মান দিতে হয়। নব্বইয়ের কবিদের আলাদা করে বাহবা কেন দেব? কবিতায় ইতর রসিকতা বা অশ্লীলতার আমদানি পাই কবিওয়ালা থেকে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। এঁরা ইতিহাসের অন্তর্গত হয়েছেন; ইতিহাস রচনা করেননি মনে রাখতে হবে। নব্বইয়ের কবিদের অধিকাংশই চপলতা, চটুলতাকে প্রকাশভঙ্গির অনন্য পন্থা ভেবেছেন। কবিতার ভাব ও আদর্শ তাতে জলাঞ্জলি গেলেও ক্ষতি নেই। অবশ্য এ-ব্যাপারে সৎ পরামর্শ দিতে গেলে পিনাকী ঠাকুরের মতো কবিরা বিদ্রূপ করবেন— "এইরকম ফতোয়া-দেওয়া লেখকরা কিন্তু আমাদের যৎসামান্য লেখা নিয়ে স্পষ্ট কোনও আলোচনা করছেন না।" তিনি জানতে চান কোথায় তাঁদের ত্রুটি বা নিজস্বতা। যেটুকু আলোচনা করেছি তাতে নিশ্চয় এ-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলি, নব্বইয়ের কবিদের তালিকায় দু'চার জন কবির অনুপ্রবেশ বেশ অস্বস্তিকর। অন্তত আশির কবি হলে মানিয়ে যেত। কেননা এঁদের জন্মসাল ১৯৫৭, ১৯৫৯, ১৯৬৩, ১৯৬৪-এর মধ্যে। এঁরা যদি নব্বইয়ের দশকের দাবিদার হন,

সে-ক্ষেত্রে মনে হয় তাঁরা শিং ভেঙে বাছুর হতে চান।

আমরা নিশ্চয় এ-কথা বলি না, এ-কালের কবিরা পাঁচালি লিখবেন। স্মার্টনেস কবিতাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। কিন্তু ভঙ্গি যদি চোখ ভোলাতেই ব্যস্ত হয়, তাৎক্ষণিক চমক তৈরি করে, তখন তার স্থায়িত্ব ও গভীরতা নিয়ে সংশয় জাগে। কবিতায় নতুন কিছু আর বলার নেই— সেই মানুষ, প্রেম, কাম, গাছ-ফুল-পাখি-নদী— বারে বারে ব্যবহৃত হয়েছে, বলেছিলেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাহলে কেন কবিতা লেখা? নতুন করে ও নতুন ভাবে বলার জন্য, লেখার জন্য কবিতা লেখা ও পড়া। নতুনত্বের দাবি সর্বদা স্বাগত। নতুন হওয়ার ঝোঁকে ম্যানারিজ্‌ম বা ভাঁড়ামি এলে ভালো লাগে না। ভালো লাগে না কবিতার রহস্যকে ভেঙে দেবার শস্তা আয়োজনও। জল ফুরোলে পাঁক নিতে হয়, আধুনিক কবি ও কবিতা সম্পর্কে তিনের দশকে রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন। এখনকার কবিরা সেই সতর্কবাণী মনে রাখেননি। ফলে, পাঠকপ্রিয় হতে, পুরস্কার ও বাহবা পেতে ফাস্ট ফুডের মতো মুচমুচে ও চট্‌জলদি কবিতা লেখেন। শোনা বা পড়ামাত্র ভালো লাগে, মনে হয় 'বাহ্, বেশ তো।' তারপর? — 'শুধু ধূলি, শুধু ছাই/মূল্য তার কিছু নাই'। মূল্য সমর্পণ করার প্রতিভার অভাব অনুভূত হয়। তখনই মনে হয় কবিতার দুর্দিন এসে গেল। পরিশ্রম নেই, ভাবনা নেই, উদ্দেশ্য বা আদর্শ নেই— আঁতলামি আছে, সব কিছু নস্যাৎ করার হিরোশিপ আছে, নিজের সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত গর্ব ও উচ্চ ধারণা আছে। গোষ্ঠীবাজি করে পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ আছে। ইহজীবনে আর কী চাওয়ার ও পাওয়ার থাকতে পারে? এখন তো 'কবি' বানানো হয়। হওয়ার জন্য সাধনার দরকার নেই। দরকার যোগাযোগ, লাইন বা চ্যানেল। সবার উপরে আছে বাজারি পত্রিকা গোষ্ঠীর আনুকূল্য। কে লেখক, কে কবি, কে পণ্ডিত, কে সমালোচক হবেন তার নির্ধারক তাঁরাই। বুদ্ধিমান যারা, তারা জানে, এই বিশেষ সংস্থাকে ধরতে হয়, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়। ফলে, পশ্চিমবাংলার বাইরে যাঁরা বাংলাভাষায় কবিতা লিখছেন, তাঁরাও আর আলোকিত হন না।

প্রসঙ্গত বলি, নব্বইয়ের কবিদের কোনোভাবে আঘাত বা অসম্মান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি চাই, তাঁদের ভিতরে যে প্রতিভা ও ক্ষমতা আছে তা গড্ডল প্রবাহে যেন ভেসে না-যায়। তাঁরা যেন মনে রাখেন, কোনো ইডিয়োলজি/ভাবাদর্শ ছাড়া কোনো কবিই বড় হতে পারেন না; স্মরণীয় হতে পারেন না। অডেন যতই বলুন 'স্মরণীয় উক্তি' রচনাই কবির কাজ, তা আংশিকতা দোষে দুষ্ট। এমন-কি এজরা পাউন্ড যখন মনে করেন, একটি সার্থক ইমেজ রচনা করাই কবির কাজ, তাও সর্বথা মান্য নয়। সমগ্রতাই সর্বদা কাম্য। কিছু কবি খণ্ডতার উপাসক হয়ে কীভাবে কবিতাকে লঘু ও আপাত চমৎকারিত্বের কোঠায় বন্দি করছেন তার দৃষ্টান্ত দিই।

১. *প্রলয়পয়োধিজলে কে প্রথম কার ঠোঁট কোথায় খুঁজেছি তারপর?*
দে পাড়ার টেঁপি তুমি, বোস পাড়ার লাল্টু হ্যায় হম্
মাথায় পক্ষিণী বসে, প্রজাপতি বলে যান : ঘর
(পিনাকী ঠাকুর)

২. *ওপরে তাকাও, বসন্ত এসে গেছে*
বাঁশি ফেলে দিয়ে সিটি দাও স্মার্ট কবি
ফার্স্ট ইয়ারের হিস্ট্রি অনার্স ব্যাচে
গ্রিটিংস খুলেই হেসে ফেলে বান্ধবী।
(শিবাশিস মুখোপাধ্যায়)

৩. *এই নারীদেহে শব্দ লুকানো যত*
আছে বিশিষ্ট শব্দব্রহ্ম স্থান,
উরুমূলে, নাভি, বক্ষে, জিহ্বাপ্রান্তে
তুমি তাদেরকে করো কবিতার মতো।
(বীথি চট্টোপাধ্যায়)

৪. *এখন শুধু অভিধানেই 'ভ্যাকেন্সি'*
পানের পিকে পাড়ার দেয়াল অজন্তা
ভিড়ে ধাক্কা, পেছন থেকে 'বোকাচ্চো'—
নন্দনে শো, আমার ভুবন, মৃণাল সেন...
(শ্রীজাত)

৫. *ঘুরে মরে কানামাছি*
টানেলে দাঁড়িয়ে আছি
তোমাকে ভিতরে টেনে আঁধারে মিলিয়ে গেল মেট্রো
স্টেশনে রইল পড়ে মৃত সম্পর্কের রেট্রো
লাস্ট মেট্রো।
(বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়)

৬. *তাহলে? তাহলে? স্বপ্ন কয়—*
হ্যাঁ, চলো ঝাঁপিয়ে পড়ি জলে,
মাত্রাছাড়া জোছনা এলো দেশে
চলো প্রেম করি ফলিডলে

(বিভাস রায়চৌধুরী)

এই কবিদের হাতে শব্দ ও ছন্দ এবং ভাব আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই। প্রভাত চৌধুরী ঠিকই বলেছেন, "এরা ঠিক স্বপ্নচারী নয়, এরা যেন-বা স্বপ্নলোকের শিকারী। এরা অপেক্ষা করে না।" (দ্র. অমৃতলোক, শারদ ১৪০২)। যদিও তিনি অন্ধের মতো এঁদের বাহবা দিয়ে গেছেন। যেমন 'অভিভব' পত্রিকায় আরেক সমালোচক বলেন, "বস্তুত তত্ত্বকে মাথায় রেখে কবিতা লেখা নব্বইয়ের ধাতে নেই।" তত্ত্ব থাকতেই হবে এমন নয়; কবিতার সত্য তো দরকার। অবশ্য এই নব্বইয়ে কিছু কবি আছেন যাঁরা মগ্ন হয়ে নিজের মতো লিখছেন। গিমিক-এ গা ভাসাননি। ভরসা করি সেইসব 'সিরিয়াস' কবিরা কবিতার সুদিন ফিরিয়ে আনবেন। কবিও স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হবেন। আধুনিকতা, উত্তর-আধুনিকতা ইত্যাদি আঁধি পেরিয়ে যথার্থ কবিতা লেখা হোক, চাই। বিশ্বাস করি, বাংলা কবিতা জীবন্ত, চলমান। জীবদেহের মতো তারও বিবর্তন প্রত্যাশিত। শর্ত একটাই : তাকে কবিতাই হতে হবে। ❑